রোশনাই

'শারদোৎসব

রোশনাই

সম্পাদক

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়

ভরদ্বাজ পাবলিশিং হাউস

কলিকাতা

কোন গ্রন্থ-সম্পাদনায় সম্পাদকের একটা কৈফিয়ৎ থাকা অপ্রাসঙ্গিক নয়।

ছেলেদের জন্যে কিছুকাল কয়েকখানি কাগজের সম্পর্কে এসে দেখেছি যে, সবকিছুর চেয়ে গল্পই ছেলেরা ভালবাসে বেশি এবং গল্প পেলে আর কিছুই বোধ হয় তারা চায় না। তাই একদিন ইচ্ছে হ'ল কয়েকটি নতুন গল্পের একটি সংগ্রহ বার ক'রে তাদের চিত্তবিনোদন করার। ভাগ্য বোধ হয় তখন সুপ্রসন্ন ছিল তাই সঙ্গে সঙ্গে বোঝাও ভগবান বয়ে আন্‌লেন,—প্রকাশক মিল্‌লো।

এর পর আরম্ভ হ'ল আমার কাজ। আমি কোমর বাধলুম; ছুটলুম সাহিত্যিক বন্ধুবান্ধবের কাছে। আশা ছিল পয়সা যখন হাতে তখন সহজেই সকলকে কাবু করতে পারব; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তা' বেহাত করেও হাবুডুবু খেতে হ'ল, নানান অসুবিধার মধ্যে। লেখা যাচাই করার অবসর পাই নি, নামের দিকেই নজর ছিল বেশি; অতএব তার বিচার করবেন পাঠকরাই।

নামের ব্যাপারে আর একটি কথা এখানে উল্লেখ না ক'রে উপায় নেই, সেটি হচ্ছে এই যে: বন্ধুবর খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্রের নাম এই গ্রন্থের লেখক হিসাবে বিজ্ঞাপিত ও প্রচ্ছদপটে মুদ্রিত হওয়া সত্বেও, শেষ মুহূর্ত্তে অসুস্থতার জন্যে তিনি তাঁর প্রতিশ্রুত গল্প আমাদের দিতে পারেন নি। আশা করি পাঠকগণ এ-ত্রুটি আমার ভাগ্যবিড়ম্বনা বলেই মার্জ্জনা করে নেবেন।—ইতি।

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়

সূচীপত্র

আসলে হরিশবাবু একজন খুদে হাকিম; কিন্তু বৃক্ষহীন দেশে এরণ্ড যে-কারণে মহাদ্রুম, সেই কারণেই তিনি এখানকার একজন বাঙালী হিটলার। জীবনে তার দুটিমাত্র আকর্ষণ ছিল: এক, নির্মম কর্তব্যপালন: অন্য, রসনা-সেবা, সোজা কথায়—খাওয়া। শেষের ব্যাপারে হিটলারের সঙ্গে তাঁর প্রকাণ্ড অমিল। হিটলার শোনা যায় নিরামিষাশী, কিন্তু হরিশবাবু আস্ত একটি পাঁঠা খেয়ে হজমিগুলি হিসেবে বাহান্ন থেকে বাষট্টিটা লেডিকেনি পরিপাক করেন—বলা বাহুল্য, নেমন্তন্ন-বাড়িতে। তাঁকে নেমন্তন্ন করা মানে গৃহস্থের

বাণপ্রস্থে যাওয়া, কিন্তু এত বড় মান্য মহাজনকে নেমন্তন্ন না করা মানেও সেই বনবাস। অথচ যদি তিনি বোঝেন এ-দুধকলা দিচ্ছ তাঁকে বশ মানাতে, তবে সে-দুধকলা তো তিনি নেবেনই, অধিকন্তু দংশন করতেও ছাড়বেন না।

আর, প্রথম ব্যাপারে, মানে কর্তব্যপালনে তিনি একেবারে মমতাহীন। 'ভুল হয়েছে স্যার, এবারটি মাপ করুন, আর কক্খনো এমন হবে না।'—এ-কথা বলে' শত কাঁদাকাটা করলেও তিনি একচুল বিচলিত হবেন না : বলবেন, 'ছাদ থেকে পা ফসকাবার ভুল করলে মাধ্যাকর্ষণের শক্তি কি আপনাকে ক্ষমা করবে? আর কক্খনো করবো না, এবারটি ছেড়ে দিন, এ-কান্না কাঁদবারই কি তখন স্পর্ধা থাকবে আপনার? পা ফসকেছেন কি, ভেঙে, থেঁৎলে শেষ হয়ে গেছেন। কি, সত্যি নয়?'

তারপর অপরাধী হয়তো বলবে, 'আপনি মানুষ, আপনার যেমন শক্ত হাড় আছে তেমনি আবার কোমল মাংসও আছে। দুঃখ আপনি দিতে পারেন তা ঠিক, কিন্তু দুঃখ পেলে কেমন লাগে তা বোঝবার ক্ষমতাও ঈশ্বর আপনাকে দিয়েছেন। প্রকৃতি দেখতে পায়না শুনতে পায়না, কে তার নিয়ম ভাঙলো, সে শিশু না বুড়ো, দোষী না নির্দোষ বিচার করতে পারে না, কোনো মহৎ কাজেও যদি কেউ ছাদ থেকে নীচে লাফিয়ে

পড়ে, তাকেও সে নিষ্পেষিত করে। কিন্তু আপনি সুখ-দুঃখ ভালো-মন্দ সব বুঝতে পারেন, বিচারের আসনে আপনি ঈশ্বরের প্রতিনিধি, আপনি যদি না গরিবের দিকে তাকান তবে যাবো কোথায়?'

হরিশবাবু নির্লিপ্তের মতো বললেন, 'আমি কে? আমি কেউ নয়। আমি নিমিত্ত, আপনাকে যে শাস্তি দিচ্ছে সে হচ্ছে আইন বা নিয়ম, প্রকৃতিরই মতো সে হৃদয়হীন। অতএব আইন যে প্রণয়ন করেছে সেই ঈশ্বরকে যত খুসি তিরস্কার করুন, আইন যে প্রয়োগ করছে সেই প্রকৃতিকে দুষবেন না।'

আগুন মাত্রেই আগুন—তা সে দেয়াশলাই-এর আগুনই হোক আর আগ্নেয়গিরির আগুনই হোক। তেমনি নিয়মমাত্রই নিয়ম। আত্মরক্ষা ছাড়া কাউকে খুন করবে না এ যেমন নিয়ম, L-এর মাথা কাটবে এ-ও তেমনি নিয়ম। রাস্তার বাঁ পাশে না চলে' যদি তুমি তোমার মোটরে ধাক্কা খাও, তবে সে-ধাক্কায় তুমি আহত হয়েছ ব'লেই আইন তোমাকে রেহাই দেবে না, তলব হবে, কেন তুমি আহত হতে গেলে। আত্মহত্যা করতে না পেরে তুমি যদি বেঁচে ওঠ, তোমার শাস্তি হবে, কেন গিয়েছিলে নিজের প্রাণ নিতে, বেঁচে উঠেছ বলে' তোমাকে সমাজ আশীর্বাদ করবে না। অতএব

যদি নিয়ম থাকে, এগারোটার সময় তোমাকে আপিসে আসতে হবে, আর তুমি তার পরে আস, সে-নিয়ম-ভঙ্গের জন্যে তোমাকে শাস্তি পেতেই হবে, এই দেরির কারণ তোমার ছেলের অসুখ বা রাস্তায় বৃষ্টি বা আর কিছু, সবই অবান্তর, অর্থহীন। নিয়ম নিয়ম—স্পষ্ট, দৃঢ়, নির্ধারিত। ব্যতিক্রম করেছ কি তোমাকে ভুগতেই হবে।

এ হেন নিয়মের নির্মম প্রতীক আমাদের হরিশবাবু। জায়গাটা গ্রাম, জীবনযাত্রাটাও তাই ছিল শিথিল, খানিকটা শৃঙ্খলাহীন। জামার তলায় বই রেখে পরীক্ষায় টুকছে যে ছেলে তার পিছনে নিঃশব্দ পায়ে হেডমাষ্টারের আকস্মিক আবির্ভাবটা কল্পনা করো। তেমনি দ্রুত ও নিশ্চিত তৎপরতায় হরিশবাবু আপিসের সমস্ত বিশৃঙ্খলা ও দুষ্কার্যের সামনে এসে দাঁড়ালেন। আর যখন যে-বিচ্যুতি তিনি ধরলেন তার জন্যে দায়ী যে-অপরাধী তাকে বিচ্যুত করবার কর্তব্যে পশ্চাৎপদ হলেন না। দু'দিনে সমস্ত আপিসে এবং আপিস ছেড়ে সমস্ত সহরে জাগ-জাগ সাড়া পড়ে' গেল—যেন পুচ্ছ তুলে উড়ে' এসেছে এক ধূমকেতু—এই লেগে গেল একটা সংঘর্ষ!

ক'দিন যেতে-না-যেতেই নরহরিকে তিনি হাতে-নাতে ধরে' ফেললেন। কোন এক মুহুরির কাছ থেকে সে ঘুষ নিচ্ছিলো।

'ওটা কী ?' হরিশবাবু হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন।

'টাকা একটা।' নরহরি হাতের মুঠটা খুলে দেখালো।

'কে দিল ?'

'ও।' নরহরি আঙুল দিয়ে লোকটাকে দেখিয়ে দিল এবং সেই মুহূর্তেই সেই লোকটা পিছলে পালিয়ে গেল।

'দিল কেন ?' হরিশবাবু ফের প্রশ্ন করলেন।

নরহরি একবার ঠোঁট চাটলো কিনা বোঝা গেলনা। বললে, 'টাকাটা ও আমার কাছ থেকে হপ্তাখানেক আগে ধার নিয়েছিলো, আজ শোধ করে' দিল।'

হরিশবাবু নাকের মধ্যে থেকে সংক্ষিপ্ত একটা শব্দ করলেন মাত্র।

লোকটাকে তিনি চিনে রেখেছিলেন। ধরলেন তাকে নিজেই। বললেন, 'টাকাটা নরহরিকে যে দিলেন তার কারণটা আমি জানতে পারি কি ?'

লোকটা তার মাথা চুলকোলো কিনা ঠিক বোঝা গেল না। বললে, 'আসচে শনিবার ও সদরে যাবে, সেখান থেকে একটা ওষুধ কিনে আনবার জন্যে ওকে দিয়েছি। এখানে পাওয়া যায়না সে-ওষুধ।'

'ওষুধের নাম বলে' দিয়াছেন ?'

'টাকাটা দিতেই আপনাকে দেখতে পেয়ে পালিয়ে এলুম। তাড়াতাড়িতে নামটা বলে' আসতে পারিনি।'

'বেশ তো, আমাকে বলুন নামটা।'

লোকটা হয়তো এবার শুকনো গলায় ঢোঁক গিললো। বললে, 'নাম—নামটা আমার এখন ঠিক মনে আসছে না। প্রেসক্রপশানে লেখা আছে—এই যে এইখানে ছিল—' বলে' সে ব্যস্ত হাতে তিন-তিনটে পকেট হাটকাতে লাগলো।

হরিশবাবু আবার একটা সংক্ষিপ্ত শব্দ করলেন।

সেই থেকে তিনি নরহরির প্রতি একেবারে প্রাণহীন পাথর হয়ে আছেন। আসন্ন মৃত্যুর যেই স্তব্ধতা, সেই ভয়ঙ্কর স্তব্ধতা তার মুখে আঁকা। নরহরি দু' চোখে বিশাল অন্ধকার দেখলো, পাথরের মতো অনড় সেই অন্ধকার। নরহরি চল্লিশ পেরিয়ে গেছে, অনেকগুলি সন্তানের সে বাপ, বহু পোষ্য তার পরিবারে—এই দুর্দিনে চাকরটি যদি তার যায়, তবে শুধু সে দরিদ্র হবেনা, সর্বস্বান্ত হবে, কেননা সে হবে ধিক্কৃত, কলঙ্কিত, সবাইর চোখের সামনে অপমানিত—স্ত্রী-পুত্র আত্মীয়-স্বজন সবাইর মুখের দিকে সে চাইবে কি করে'? যে তোমার টাকা নেয়, সে কিছুই নেয় না; আর যে নেয় তোমার সুনাম সে নেয় তোমার সর্বস্ব। কী করবে নরহরি কিছুই বুঝতে পারে না। একবার মনে করে হরিশবাবুর পায়ে

জড়িয়ে ধরে' সে ক্ষমা চায়, কিন্তু যেখানে হরিশবাবু নিজে একেবারে নিঃশব্দ, সেখানে গায়ে পড়ে' পায়ে-পড়াতে তার প্রবৃত্তি হয় না। উনি যদি নিষ্ঠুর ধমক দিয়ে ওঠেন তবেই কান্নাটা শোভা পায়, যদি খড়্গ উঁচিয়ে ধরেন, তবেই পায়ে-পড়াটা সহজ হয়ে ওঠে। কিন্তু যেখানে তিনি সম্পূর্ণ গম্ভীর, সেখানে শঙ্কিত ও সন্দিগ্ধ হওয়ার বেশি নরহরি আর কিছুই করতে পারে না। একবার মনে করে, গরিব ভেবে তাকে মার্জনা করেছেন বলেই হয়তো হরিশবাবু এমনি চুপ করে' গেছেন, কিন্তু পরমুহূর্তেই যখন তাঁর ক্রোধস্ফীত গোঁপটা তার চোখে পড়ে, মনে সান্ত্বনার বাষ্পটুকুও আর অবশিষ্ট থাকেনা।

যা হবার তাই হবে—নরহরি অপন মনে কাজ করে আর প্রাণপণে চেষ্টা করে প্রভুকে সে কী ভাবে খুসি করবে, যাতে যা হবার তাই যেন না হয়। হরিশবাবুর নিম-ডালের দাঁতন দরকার, নরহরি নিজের হাতে সম্পূর্ণ একটা গাছই কেটে আনে। হরিশবাবুর বাড়িতে কে-এক অতিথি এসেছে, তার জন্যে একখানা তক্তপোষ দরকার—নরহরি তার নিজের শোবার খাটখানা বয়ে নিয়ে আসে—নিজে শোয় চট বিছিয়ে। হরিশবাবুর ছেলেরা ব্যাডমিনটনের ক্লাব খুলেছে, চাঁদা চায়, নরহরি সবাইর মাথা ডিঙিয়ে পাঁচ টাকা চাঁদা দেয়। ইস্কুলের প্রাইজের সভায় মেডেল ঘোষণা করে একমাত্র নরহরি, আর

তা আর-কাউকে নয়, একমাত্র হরিশবাবুর ছেলেকে। হরিশবাবুর স্ত্রীর হলো জ্বর, রাত জাগলো এসে নরহরির স্ত্রী। নিরন্তর এই নরহরির সাধনা, কি করে' প্রভুর মনোরঞ্জন করবে। কোলকাতা থেকে অকালের তরকারি কিনে এনে হরিশবাবুকে গিয়ে বলে দেশের থেকে এসেছে; গ্রামান্তরের হাট থেকে প্রকাণ্ড মাছ কিনে এনে বলে তার পুকুরের মাছ। কিন্তু কিছুতেই যেন হরিশবাবুর মুখের ভাব কোমল করা যায় না, শত ঘি আর মধু আর মাছের তেল মাখিয়েও।

দেখতে দেখতে এসে গেল পূজার ছুটি—হরিশবাবু বাড়ি যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। বাড়ির জন্যে এটা নেবেন, ওটা নেবেন—কচু আর নারকেল, চমচম আর ছানাবড়া—লটবহরের আর অন্ত নেই। জলে জীইয়ে হাঁড়ি-ভর্তি কই মাছ, কাঠের বাক্সে পুরে জ্যান্ত দুটো কচ্ছপ। সব জোগাড় করে' দিল নরহরি, সাত দিন ধরে', সকাল-সন্ধ্যে আপ্রাণ পরিশ্রম করে'। পদব্রজে আর নৌকোয় মোটমাট ঘুরেছে সে একশো বিরানব্বুই মাইল। তবু যদি প্রভু সন্তুষ্ট হন। তারপর সে আর তার দুই ছেলে, বিমল আর শ্যামল, একজন চোদ্দ বছরের আরেক জনের বয়েস দশ, মোটঘাট সব প্যাক কার দিয়েছে—সর্বসাকুল্যে বত্রিশটা মাল। বাবা যে একটা

শাস্তি

কী বিপদে পড়েছেন যার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ হরিশবাবুর মনোরঞ্জন দরকার সে কথা ছেলে দুটির বুঝতে আর বাকি নেই—তাই খাটছে তারা অক্লান্ত, যে যখন যা বলছে তাই তখন তারা করে দিচ্ছে, এবং যখনি একটু থতমত খাচ্ছে তখনই তাদের বাবার রক্তচক্ষু তাদের দ্বিধাগ্রস্ত মনে প্ররোচনা জাগাচ্ছে। তাই হরিশবাবুর কোন ছেলের হঠাৎ একডজন লাট্টুর দরকার, কার জুতো-সেলাইর জন্যে মুচি চাই, দীঘির থেকে পদ্ম ছিঁড়ে আনতে হবে গুচ্ছ করে,' সর্বত্র ছুটছে এই বিমল আর শ্যামল—জল সাঁতরে, কাদা ভেঙ্গে, রাস্তার খোয়ায় হোঁচট খেয়ে-খেয়ে। তারপর হরিশবাবুর কোন এক ছেলে যখন বললে তাকে এখুনি একটা গুলতি বানিয়ে দিতে হবে, বিমল প্রতিবাদ করেছিলো, অমনি নরহরি তার কান মলে' দিয়ে বললে, 'বানিয়ে দিতে না পারিস নিজেরটা দিয়ে দে না।' তাতেও নিবৃত্তি নেই, আরেক ছেলে বললে, রঙচঙে কাচের মার্বেল চাই তার এক মুঠো। শ্যামলের প্যান্টের পকেটে যে একরাশ কাচের মার্বেল ঝমরঝম করছে ছেলেটার তা দৃষ্টি এড়ায় নি, বললে, নিদেনপক্ষে ওগুলোই তার চাই। শ্যামল পালিয়ে যাচ্ছিলো, নরহরি তার হাত ধরে' ফেললে। বললে, 'দিয়ে দে।' শ্যামল সামান্য একটু বাধা দিতে গিয়েছিলো, নরহরি তার কনুইয়ে প্রচণ্ড একটা চিমটি কাটলে,

আর সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্রবর্ণ কাচের মার্বেলগুলি পকেট উজার করে' ছিটিয়ে পড়তে লাগলো।

তবু, এইটুকুই তাদের আশা, বাবার উপর মুনিব যদি তুষ্ট হন, বাবার বিপদটা যদি কেটে যায়! তুচ্ছ কতগুলি মার্বেল তুচ্ছ একটা গুলতি!

ভর-সন্ধের সময় ট্রেন। ইষ্টিশানে যাবার রাস্তা হচ্ছে পায়ে হেঁটে—প্রায় তিন-পো মাইল রাস্তা। রুগী, বুড়ো বা স্ত্রীলোকের জন্যে পালকি আছে, কিন্তু মাল যাবে শুধু কুলির মাথায়। হরিশবাবুর বত্রিশটা মালের জন্যে কম করে' আটটা ভাড়াটে কুলি দরকার, কিন্তু জোগাড় হয়েছে শুধু ছ'টা। নরহরিও গোটা কয়েক মাল, হাতে-কাঁধে তুলে নিয়েছে, তবু থেকে যাচ্ছে একটা সুটকেশ আর দু'টো খুচরো মাল, জলের কুঁজো আর গ্রামোফোনের রেকর্ডের বাক্সটা।

হরিশবাবু তীব্র বিরক্তি প্রকাশ করলেন, অন্তত আরেকটা কুলি নরহরি কেন জোগাড় করে' আনতে পারে নি।

অগত্যা নরহরি বিমলকে বললে, 'তুই সুটকেশটা মাথায় তুলে নে। আর হাতে নে এই রেকর্ডের বাক্সটা। আর শ্যামল, তুই নিয়ে চল এই জলের কুঁজোটা।'

যথেষ্ট কুলি জোগাড় করে' আনতে পারেনি বলে' বাবা যে মুনিবের বিরক্তিভাজন হয়েছে এটা বিমল আর শ্যামল স্পষ্ট

বুঝতে পারলো। তাই তারা আর কোনো প্রতিবাদ করলো না, বাবা যদি এতখানি করতে পারেন তারাও এইটুকু করতে পারবে এই আনন্দে তারা মাল তুলে নিল।

হরিশ বাবু অস্ফুট একটু গুঞ্জন করলেন: বাচ্চাদের দিয়ে বওয়াচ্ছেন কেন?'

নরহরি বললে, 'তাতে কি? ছেলে-বয়েস থেকেই শারীরিক পরিশ্রম করতে শেখা উচিত। দেহের পরিশ্রম করতে কুণ্ঠিত বলেই তো বাঙালীদের এই দুর্দশা।'

কুঁজো নিয়ে শ্যামল চলেছে।

বলেই মানসিক আতঙ্কে নরহরি জিভ কাটলে। কেননা হরিশবাবুর চার-চারটে ছেলের কেউই একটাও মাল নেয়নি হাতে করে'। বাঙালীদের দুর্দশা বলতে গিয়ে এই পুত্র-চতুষ্টয়ের প্রতি সে একটা ব্যঙ্গের ভাব পোষণ করছে এই কথা যদি হরিশবাবু সন্দেহ করে' থাকেন তবে শ্যামল-বিমলের এই মালবহনের দুঃখটা একেবারেই মূল্যহীন হয়ে যাবে।

গাড়ি-ছাড়ার পরিষ্কার একঘণ্টা আগে হরিশবাবুর ইষ্টিশানে আসা চাই, বিশেষ করে' যেখানে বত্রিশটা তাঁর মাল, পুরো আর হাফ-টিকিট নিয়ে সাড়ে চোদ্দজন তাঁরা যাত্রী। এসে দেখা গেল ডাউন-ট্রেনটা এসে এখনো পৌঁছায়নি, যেটার চল্লিশ মিনিট পরে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে ফের উজান যাবার কথা। তবে দূরের সাইডিং-এ ট্রেনের একটা কর্তিতাংশ আছে দাঁড়িয়ে, যেটা যথাসময়ে উজান-গাড়িতে সংযুক্ত হয়ে একই সময়ে ধাবমান হবে। হরিশবাবু বললেন, 'ধীরে-সুস্থে ঐ গাড়িটাতে গিয়েই আশ্রয় নেয়া যাক। ইঞ্জিন এসে ওটাকে ঠিক টেনে নিয়ে আসল গাড়ির সঙ্গে জুড়ে দেবে তো ?'

সবাই সমস্বরে সমর্থন করলে। কামরার দরজা খোলে না, নরহরি চাবি নিয়ে এল ইষ্টিশান-মাষ্টারের কাছ থেকে চেয়ে। ঝাঁটা চেয়ে এনে ঝাঁট দেওয়ালো কামরাটা। তিন-

তিনটা লম্বা বেঞ্চি জুড়ে পুরু করে' প্রথম বিছানা পাড়লে, তারপর বেঞ্চির নিচে আর বাঙ্কের উপরে এক-এক- করে' মাল সাজিয়ে দিতে লাগলো।

সপরিবারে হরিশবাবু এসে অধিষ্ঠিত হলেন। প্রথমেই সাড়ে চোদ্দজন লোক মিলিয়ে নিলেন ও পরে কখনো গলা উঁচিয়ে কখনো বা কোমর ভেঙে গুণে নিতে লাগলেন ঠিক ঠিক বত্রিশটা মালই উঠেছে কিনা। যতবার গোণেন ততবারই একত্রিশ হয়। যে যখনি গোণে একত্রিশের উপরে আর উঠতে পারে না। একটা মাল নির্ঘাৎ কোথাও থেকে গেছে। কী—কী সেটা? নরহরি অন্ধকারে হাঁপিয়ে উঠলো।

'আসল জিনিষটাই ওঠেনি।' হরিশবাবুর স্ত্রী সহসা চেঁচিয়ে উঠলেন: 'কুঁজো, জলের কুঁজোটা কোথাও দেখতে পাচ্ছি না।'

'সর্বনাশ!' মুখ-চোখ বিবর্ণ করে' হরিশবাবু বসে' পড়লেন।

এত জিনিষের মধ্যে জলের কুঁজোটাই যে আসল এবং ওটার অভাবে যে সর্বনাশ সমুপস্থিত তাতে আর সন্দেহ কী! নরহরি আমতা-আমতা করে' বললে, 'ওটা শ্যামলের হাতে ছিল। শ্যামল এখনো এসে পৌঁছয় নি দেখছি।'

'আর পৌঁছবে বলে'ও মনে হচ্ছে না।' হরিশবাবু চাপা গলায় ঝাঁঝিয়ে উঠলেন: 'অমন একটা দরকারি জিনিষ ওর হাতে দিতে গিয়েছিলেন কেন? একটু কষ্ট করে' নিজে টেনে আনলেই তো পারতেন। রাস্তায় কোথায় ভেঙে ফেলেছে তার ঠিক কি?'

শোকাকুল কণ্ঠে গৃহিণী বললেন, 'গত বছর মধুপুর থেকে ওটা কিনেছিলাম—পাঁচ আনা পয়সা। কী ঠাণ্ডা হত জলটা! এখন সগুষ্টি গলা শুকিয়ে মারা যাই আর-কি।'

বড় ছেলে নরহরিকে হুকুম করলে, 'এখন এখান থেকে একটা কুঁজো জোগাড় করে' দিন শিগগির। জল না থাকলে মিষ্টি-ফিষ্টি সব খাব কি করে'?'

নরহরি অপরাধীর মতো বললে, 'এখানে তো পাওয়া যায় না কুঁজো।'

'পাওয়া যায় না তো ব্যবস্থা একটা করে' দিতে হবে।' হরিশবাবু এবার ধমকে উঠলেন: 'জল ছাড়া এঞ্জিন চলতে পারে কিন্তু আমরা চলতে পারি না। মাটির একটা কলসী-টলসিই না হয় জোগাড় করে দিন।'

হরিশ-গৃহিণী বললেন প্রায় কাঁদ কাঁদ গলায়, 'কুঁজো ছাড়া জল অমন ঠাণ্ডা হবে কি করে'? শুধু খাওয়ার জন্যে তো নয়, অডিকোলন দিয়ে আমার কপালেও তো মাঝে-মাঝে জলপটি

দিতে হবে। ট্র্যাভেল করবার বেলায় আমার কপালের রগ দুটো যে দপদপ করে এ-কথা তোমার মনে নেই? কলসী-টলসি পেলে গলায় বাঁধা যায় বটে, কিন্তু জলের জন্যে মধুপুরের কুঁজো চাই।'

নরহরি যেন সমুদ্রে পড়লো। বিমলকে জিগগেস করলো: 'শ্যামল এখনো আসছে না কেন?'

বিমল বিমর্ষমুখে বললে, 'ছেলেমানুষ, আস্তে-আস্তে আসছে।'

নরহরি ধম্‌কে উঠলো: 'খাবার বেলায় তো আস্তে-আস্তে খায় না। এখন রাস্তার মাঝখানে কুঁজোটা ভেঙে ফেললেই হয়।'

'ভেঙে-ফেলাটা মোটেই আশ্চর্য্য নয়।' বিমল চিন্তিতমুখে বললে, 'ভেঙে গেলে কী হবে বাবা?'

নিজের কপালটাতে আঙুল রেখে নরহরি বললে, 'সঙ্গে-সঙ্গে এটাও ভাঙবে চৌচির হয়ে। চাকরিটি যাবে আর তোদের সবাইকে নিয়ে পথে বসবো।'

বিমল ভীষণ ব্যস্ত হয়ে উঠলো। বললে, 'বাবা আমি এগিয়ে গিয়ে দেখবো? ও হয়তো পথে কোথাও বসে একটু জিরিয়ে নিচ্ছে।'

'তাই যা ছুটে। যদি কাছাকাছি দেখতে পাস আর

দেখিস যে কুঁজোটা আস্ত আছে, তক্ষুনি ওটা ওর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে ছুটে চলে' আসবি। একটুও দেরি করবি না।'

'আর যদি দেখি বাবা, কুঁজোটা ভেঙে ফেলেছে?' বিমল ভয়ে-ভয়ে জিগগেস করলে।

'তা হলে এই লাঠিগাছটা দিয়ে পিটতে পিটতে ওকে লাস করে' ফেলবি।' নরহরি সামনের একটা গাছ থেকে সক্রোধে একটা ডাল ছিঁড়ে ফেললো। বললে, 'ভাঙা কুঁজোর সঙ্গে ওর লাস দেখতে না পেলে আমার শান্তি হবে না।'

কতদূর এগিয়ে যেতেই বিমল শ্যামলের দেখা পেল—ডান হাত থেকে বাঁ হাতে ও বাঁ হাত থেকে ডান হাতে অনবরত বদলি করতে-করতে কাঠের ফ্রেমে-আঁটা ভারি কুঁজোটা বহু কষ্টে সে বহন করে' আনছে।

'শিগগির দে আমাকে কুঁজোটা। হাকিম ভীষণ চটাচটি করছেন।' বিমল ব্যস্তসমস্ত হয়ে বললে, এবং এই কুঁজোর মধ্যেই তাদের বাবার চাকরিটা কিভাবে আত্মগোপন করে' আছে সে-ইতিহাসটাও সে না বলে' ছাড়লো না।

'এতটা রাস্তা যখন বয়ে আনতে পেরেছি, তখন গাড়িতেও ঠিক তুলে দিতে পারবো।' শ্যামল শান্ত মুখে একটু হাসলো: 'তুই বাবাকে গিয়ে বল্ কুঁজো ঠিক আস্ত আছে, রাস্তায় এক ফোঁটা জল পর্যন্ত আমি ফেলিনি। বাবার মুখ

যাতে ছোট হয় এমন কোন কাজ আমরা করতে পারি না।'

বাবা ব্যস্ত হয়ে আছেন ভেবে বিমল ছুটে খবর দিতে গেল কুঁজোটি অটুট আছে, কানায়-কানায় পরিপূর্ণ। গৌরবটা এতখানি বহন করে এসে শেষ পর্যন্তও যে শ্যামল সেটাকে সম্পূর্ণতা দেবে এ-খবরটাতেও একটা গৌরব আছে।

ততক্ষণে আসল ট্রেন এসে গেছে এবং সেটাকে ইষ্টিশানের গায়ে রেখে এঞ্জিনটা বেরিয়ে গেছে সাইডিং-এর গাড়িটা নিয়ে আসার জন্যে। সাইডিং-এ অনেকটা এগিয়ে গিয়ে সাণ্ট্ করে' তবে মেন-লাইনে আসা যায়। সাইডিং-এর গাড়িটা খানিকদূর এগিয়ে এলে শ্যামলকে চোখে পড়লো, আর চোখে পড়া-মাত্র কামরার ভিতর থেকে অনেকগুলি কণ্ঠ একসঙ্গে কোলাহল করে' উঠলো: 'কুঁজো, কুঁজো, ঐ যে কুঁজো।'

শ্যামল দৃকপাত করলো না, ফাঁকা লাইন পেরিয়ে ছুটে গেলো সে পাশের লাইনের চলন্ত গাড়ির দিকে। বিকেলবেলা ইষ্টিশানে বেড়াতে এসে ইস্কুলের ছেলেদের সঙ্গে কত সে চলন্ত গাড়ির সরু ফুটবোর্ড লাফিয়ে উঠেছে! তারপর মেল-লাইনের গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লাগিয়ে এঞ্জিনটা যখন থেমে গেছে তখন সেই ধাক্কা খেয়ে কত তাদের ফুর্ত্তি। সেই সব দিনের চেতনা এখনো শ্যামলের গায়ে লেগে আছে, এবং

সেই সব দিনের অভ্যাসটা স্মরণ করেই গাড়ির হ্যাণ্ডেল ধরে' সে কুঁজো সমেত গাড়ির ফুটবোর্ডে লাফিয়ে উঠতে গেল।

'এই যে—এই যে আপনাদের কুঁজো—'

মুখের কথা মুখেই গেল ফুরিয়ে। আর সেই আতঙ্কিত বিমূঢ় জনতার মধ্যে থেকে নরহরি দেখলে চূর্ণ-বিচূর্ণ কুঁজোর সঙ্গে দলিত-বিধ্বস্ত রক্তাক্ত একটি মৃতদেহ। এঞ্জিনের সঙ্গে-সঙ্গে সেও উঠলো ভয়ার্ত শব্দ করে'।

কোথাও কিছুর এতটুকু নড়চড় হল না। সিগন্যালে সবুজ আলো দেখালো, আর ঠিক সময়ে গাড়ি দিল ছেড়ে। হরিশবাবুরা গাড়ি থেকে নামতে পারতেন, কিন্তু পর-পর তিন দিন পঞ্জিকায় যাত্রা নেই, তদুপরি ছুটি হবার পর কর্মস্থানে পড়ে' থাকা মানে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া সত্বেও জেলখানায় পচে মরা। কুঁজোটা ভেঙে গেছে, উপায় নেই, ইষ্টিশান-মাষ্টার তাঁর ফ্লাস্কটা ধরে দিয়ে এ-যাত্রা রক্ষা করেছেন।

এর পর, এত বড়ো একটা পুত্রশোক পাবার পর, সবাই ভেবেছিলো হরিশবাবু নরহরির উপর করুণায় নুয়ে আসবেন, এবং ঈশ্বর তার ছেলের পদস্খলন মার্জ্জনা না করলেও তিনি মার্জ্জনা করবেন নরহরির। কিন্তু ছুটির পরই তিনি

এনকোয়ারি নিয়ে বসলেন, এবং তদন্তে নরহরির ঘুষ নেয়া সাব্যস্থ হল।

পরের যেটুকু করবার করলেন উপরালা। নরহরি চাকরি থেকে বরখাস্ত হয়ে গেল। হরিশবাবুকে দোষ দিতে যাওয়া বৃথা। তিনি নিমিত্তমাত্র।

সেবার দত্তপুকুর গ্রামে যে সাহিত্য-সম্মেলনটা হয়েছিল,—মনে আছে ত, সেই সম্মেলনের সভাপতি আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। বাঙ্গলা দেশে হৈ চৈ প'ড়ে গেল, অত বড় সম্মেলনের একটিও যোগ্য সভাপতি নেই। সবাই বললে, রজনী বৈরাগী একজন আন্তর্জাতিক সাহিত্যিক, অত বড় অভিধানখানা একমাসের মধ্যে লিখে ফেলেছে, তার চেয়ে যোগ্য সভাপতি আর আছে কে ? তরুণ দল বললে, পাগল নাকি ? বোরেগী হবে সভাপতি ? ও জানে কি ? তার চেয়ে আমাদের নটবর তলাপাত্র—ওর 'বিজ্ঞানের দিগ্বিজয়' প'ড়ে দেশের কত বেকার ছেলে ব্যবসায়ে নেমেছে, ওকে সভাপতি

না করলে আমরা সভা বয়কট্ করব। আর একদল বললে, কিছুতেই না, তার চেয়ে বরং চিন্তাহরণ চৌধুরী সভাপতি হোক, ওর মতন কবিতা লেখে কে? বোম্বাইয়ের একখানা ইংরেজি সাপ্তাহিকে ওর কাব্যের দশ লাইন অনুবাদ বেরিয়েছে। ক্ষণজন্মা পুরুষ!

কিন্তু একে একে সকলের দাবি যখন বাতিল হয়ে গেল তখন, বলতে একটু লজ্জা করে, আমাকেই করা হোলো সভাপতি। খবরটা দৈনিক কাগজে বড় বড় হরপে ছাপা হোলো, সাহিত্য সম্রাট রসময় সামন্ত সভাপতি নির্ব্বাচিত। আমার ভক্তরা বললে, এই ত' চাই। তুমি অত বড় ছাপাখানার মালিক, তুমি স্বনামধন্য নোটবইর লেখক, তোমার চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তি কে? দেশবাসী আজ ধন্য। জয় রসময় সামন্ত কী জয়!

আমি রসময় সামন্ত, আমার পায়ে একটু বাত আছে। চোখে ভালো দেখতে পাইনে। তবু বন্ধু-বান্ধব নিয়ে একদিন শুভক্ষণে ষ্টেশনে এসে পৌঁছলাম। সঙ্গে বাতের মালিশ, কবিরাজী ওষুধের কৌটো, দোক্তার ডিবে, তামাক খাবার সরঞ্জাম, খান দুই গামছা। কোঁচানো ধুতি, পাঞ্জাবী আর

মট্‌কার চাদর চড়িয়েছি। নতুন জুতো জোড়া সযত্নে তুলে রেখেছিলুম, পুরনো জুতোটাতেই কাজ চলে,—কিন্তু নতুনটাই প'রে এলুম। ষ্টেশনে এসে চুপি চুপি বন্ধুকে বললুম, ভাই সভাপতি হ'তে গিয়ে পয়সা খরচ করতে পারবো না, ওরা গাড়ীভাড়া দিয়েছে ত' ?

বন্ধু বললেন, তাই ত ভাবছি। কই, দত্তপুকুরের লোক ত' এখনও এসে পৌঁছল না।

বললুম, সে কি হে, তবে যাওয়া হবে কেমন ক'রে? গাড়ীভাড়া দেবে কে ?

সকলেই মুখ চাওয়াচায়ি করতে লাগলো ; ওদিকে ট্রেন ছাড়তে আর বিলম্ব নেই। দত্তপুকুরের দল নিরুদ্দেশ। এদিকে আমি সমারোহ সহকারে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এসেছি, কাগজে-পত্রে রসময় সামন্তর খবর বেরিয়ে গেছে, চারিদিকে এত সোরগোল,—অথচ গাড়ীভাড়ার অভাবে যাওয়া হবে না, এ বড়ই লজ্জার কথা। এর পরের ট্রেনে যাওয়া সম্ভব নয়, ততক্ষণ সম্মেলন আরম্ভ হয়ে যাবে। তা ছাড়া বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়েছে, আমার মতন ছাপাখানার মালিক হ'তে পারলো সভাপতি, এমন সুযোগ ত্যাগ করলে হয়ত পাবো না। চারিদিকে করুণ চক্ষে চেয়ে দেখলুম, দত্তপুকুরের একটি প্রাণীও নেই, ট্রেন ছাড়ে-ছাড়ে,

সুতরাং লজ্জা আর অপমানের হাত থেকে বাঁচবার জন্য আমার সুট্‌কেসের ভিতর থেকে গামছার খুঁট খু'লে তিন-টাকা তেরো আনা বা'র করতে হোলো। বন্ধু গিয়ে টিকিট কেটে আনলেন। ক্ষুব্ধ ব্যথিত হয়ে ট্রেনে গিয়ে উঠলুম। আমাকে লোকে কৃপণ ব'লে জানে, কিন্তু সাহিত্যের জন্যে এত বড় ত্যাগ নিশ্চয়ই চিরদিন লোকচক্ষুর অগোচরে থেকে যাবে। দত্তপুকুরের উপরে বজ্রাঘাত হোক।

ঘণ্টা দুই পরে আমাদের ট্রেন একটা ষ্টেশনের ধারে এসে দাঁড়ালো। আমাদের কামরার সবসুদ্ধ ষোলো জন বন্ধু-বান্ধব। সাহিত্য সমালোচনা, আবৃত্তি, বক্তৃতা, রাজনীতি, পরনিন্দা,—সমস্তই এতক্ষণ চলছিলো। গাড়ী যখন দাঁড়ালো, বেলা অপরাহ্ণ। বন্ধুরা চা, বিস্কুট, কচুরি, সন্দেশ ইত্যাদির যোগে জলযোগ আরম্ভ করলেন। আমি বড়ই বিমর্ষ হয়েছিলুম কিন্তু কচুরি আর সন্দেশে মনটা একটু প্রফুল্ল হোলো। আমিও ভুরিভোজন করলুম।

সাত আট মিনিট দাঁড়িয়ে যখন আবার বাঁশী বাজলো তখন বন্ধুদের মধ্যে একটা গোলমাল শুনতে পেলুম। তিন-চারটে ফেরিওয়ালা পয়সার জন্য তাগাদা দিচ্ছে অথচ পয়সা দেবার মানুষ নেই। আমি সভাপতি, আমিই দলপতি সুতরাং সবাই আমাকেই দেখিয়ে দিয়ে মনের আনন্দে আবার

সাহিত্যসমালোচনা আর কাব্যচর্চ্চা চালাতে লাগলো। বাঁশী বেজে গেছে, সবুজ নিশানা দেখা দিয়েছে,—সেই মুহূর্ত্তে মান-সম্ভ্রম বাঁচাবার আর কোনো উপায় নেই,—অতএব নিরুপায় হয়ে আমাকে আরো তিনটে টাকা বার করতে হোলো। দু'টাকা ন'আনা দিলেই চলতো, কিন্তু তিন টাকা হাতে দিয়ে বাকি সাত আনা ফেরং পেলুম না, গাড়ী ছেড়ে ষ্টেশন পার হয়ে চ'লে গেল। আমার পেটের ভিতর থেকে কচুরি আর সন্দেশ হুড়োহুড়ি করতে লাগলো। মুখখানা হাঁড়ির মতো ক'রে আমি বাইরের দিকে চেয়ে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য উপভোগ করবার চেষ্টা করতে লাগলুম।

ষ্টেশন থেকে নেমে সামনেই ছোট নদী। আমাদের সৌভাগ্যবশত দত্তপুকুরের লোক ঘাটে উপস্থিত ছিল। তারা সবাই মিলে আমাদের অভ্যর্থনা জানালো। সাত টাকা খরচ হয়ে যাবার পর আমার মুখে আর হাসি ফুটলোনা, আমি গম্ভীর মুখে সঙ্গীদের সঙ্গে নৌকায় গিয়ে উঠলুম। নৌকাটা টলতেই তাড়াতাড়িতে আমি হুমড়ি খেয়ে পড়লুম—আমার মট্‌কার উড়ুনীখানা জলে কাদায় নষ্ট হয়ে গেল। কিন্তু রাগ করলে চলবেনা, আমি সভাপতি, সকলেই আমার দিকে চেয়ে রয়েছে।

নদী পার হয়ে গ্রামের দিকে সবাই হেঁটে চললুম। একটা লোক হারিকেন লণ্ঠন নিয়ে আগে আগে চললো। পথ অন্ধকার—তুই পাশে গাছপালার ছায়া আর শরৎকালের পথের কাদায় ধোপদস্ত ধুতি আর পায়ের চকচকে জুতো কাদা মাখামাখি হয়ে গেল। মাঝপথে আবার নতুন সমস্যা দেখা দিল। লণ্ঠনে তেল ছিল না, দেখতে দেখতে সেটা নিভে গেল, আর কোথাও আলো নেই। অতি কষ্টে, অতি সন্তর্পণে কাদা মাড়িয়ে খানা-খোন্দলে পা পিছলে আমরা যখন গ্রামের সাহিত্য-সভায় এসে পৌঁছলুম তখন প্রায় আমাদের চোখে জল এসেছে। সাহিত্যের জন্য বাঙ্গলা দেশে কে আর কবে এত তুঃখ সহ্য করেছে? অত রাগে তুঃখেও আমি, সাহিত্য-সম্রাট রসময় সামন্ত, একটু গৌরব বোধ না করে থাকতে পারলুম না।

একখানা গোলপাতার চালায় আমাদের থাকতে দেওয়া হোলো। তিনটি দিন আমাদের এখানে থাকতে হবে, কারণ তিনদিনের আগে এত বড় সম্মেলন শেষ হবে না। গ্রামের তিনচারজন লোক আমাদের সেবায় নিযুক্ত হোলো। আজ রাত্রে বিষয় নির্ব্বাচনী সভায় আমাকে সভাপতিত্ব করতে হবে। সুতরাং মুখ হাত পা ধুয়ে আহারাদি সেরে এখনই সভামণ্ডপে যাওয়া চাই। আমি আমার ঘরটিতে আমার

সুটকেশ, কাপড়, গামছা ও জুতো জোড়া বেশ গুছিয়ে সযত্নে রাখলুম। যেমন ক'রেই হোক, তিনটে দিন ত' কাটাতে হবে!

কেরোসিনের ডিবের সামনে ব'সে বুক্‌ড়ি চালের ভাত, রুক্ষ ডাল আর অম্বল দিয়ে যখন আহার আরম্ভ করলুম তখন গা বমি-বমি ক'রে এসেছে। সকলেরই সেই আহার। কিন্তু গ্রাম দরিদ্র, রাগ করব কা'র ওপর? আমাদের খাবার চারিদিকে সেই রাত্রের অন্ধকারে গ্রামের চাষী স্ত্রী-পুরুষ বালক-বালিকা ঘিরে এসে দাঁড়ালো। তাদের লোলুপ দৃষ্টির দিকে মুখ ফিরিয়ে আমার আর খেতে ইচ্ছে হোলো না। আমি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালুম, আর সেই মানুষগুলো জন্তুজানোয়ারের মতো আমাদের উচ্ছিষ্ট আহার্য্য নিয়ে চেঁচামেচি ও কাড়াকাড়ি করতে লাগলো।

ওদিকে সভামণ্ডপ প্রস্তুত। পাল টাঙানো, মঞ্চ বাঁধা, চারিদিকে আলো দেওয়া, সতরঞ্চি আর চাটাই পাতা আসর। আমি সভাপতি, সুতরাং আমার কাছেই সকলের ভীড়। কিন্তু যাবার সময় পা-বাড়াতেই দেখি আমার জুতো জোড়াটা নেই আমি চতুর্দ্দিকে খুঁজে শেষকালে বলতে বাধ্য হলুম। গ্রামের মাতব্বর নরেন চৌধুরী বললেন, যা ভেবেছিলুম ঠিক তাই। এইখানে রেখেছিলেন ত'? ব্যস,

আর দেখতে হবেনা। শিয়াল বেটারা নিয়ে পালিয়েছে। হায়, হায়—

সেই নতুন জুতোর পিছনে পিছনে আমার প্রাণটাও যেন শৃগালদের সঙ্গে ছুটতে লাগলো। কিন্তু জুতো যখন গেলই, তখন গলায় মট্‌কার চাদর আর মানায় না, পাঞ্জাবীটাও ঘরের মেঝের উপর প'ড়ে গিয়ে কাদায় আর নোংরায় মাখামাখি, অগত্য খালি পায়ে ফতুয়াটা গায়ে চড়িয়ে আমি, সভাপতি রসময় সামন্ত, সভার দিকে রওনা হলুম। মাতব্বর নরেন চৌধুরী একসময় বললেন, কত অস্থুবিধে হোলো আপনার, শহরের মান্নুষ আপনি, গাঁয়ে আসা অভ্যাস নেই—

বললুম, না, এমন আর কী অস্থুবিধে। আপনাদের এত যত্ন—

চৌধুরী সবিনয়ে বললেন, কিছুই না, সামান্যই আয়োজন। এ সবই আপনাদের আশীর্ব্বাদে।

আমরা সকলেই সভামণ্ডপে এসে পৌঁছলুম। ফুল, লতা, পাতা, কাশের ডাঁটা, ঝালর—ইত্যাদি দিয়ে সভাপতির আসন উঁচুতে তৈরি হয়েছে। সমবেত জনতা চুপচাপ। কেবল একদিকে কয়েকটা উলঙ্গ ছেলেমেয়ে আর একদল স্ত্রীলোকের ভিতরে ভীষণ ঝগড়া বেধেছে। ওটুকু গোলমাল এমন কিছু নয়। এদিকে আমাদের সভার কাজ

আরম্ভ হোলো। একজন উঠে সভাপতির নাম প্রস্তাব করলেন, একজন সমর্থন করলেন। আমি যথারীতি উঠে গিয়ে সভাপতির আসন দখল করলুম। আমার খালি পা, ময়লা ধুতি, হাতকাটা ফতুয়া,—একটা অদ্ভুত চেহারা নিয়ে আমি স্তব্ধ হয়ে রইলুম। আমার আশপাশে সব কলকাতার বন্ধু-বান্ধবের দল।

সভার কাজ আরম্ভ হবার একটু পরেই একটা গোলমাল শোনা গেল। একটা লোক সহসা ভীড় ঠেলে গোলমাল বাধিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এলো। আমি হতভম্ব। লোকটা এগিয়ে এসে সোজা আমার কোঁচার খুঁট চেপে ধ'রে চেঁচিয়ে উঠলো, গরীবের পয়সা মেরে পালিয়েছ, বাবু! মনে নেই, নদীতে নৌকো পার করেছি? সাড়ে আটআনা সতেরো জনের। পয়সা যদি না দাও ত' কাপড় ছাড়বো না।

সবাই হৈ হৈ রৈ রৈ ক'রে উঠলো। সভাপতির এত বড় অপমান? মার বেটাকে।—সবাই ছুটে আমার মঞ্চের উপরে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে লোকটাকে যখন মারধোর করতে যাবে এমন সময় 'গেল, গেল আরে-রে-রে-রে—'ইত্যাদি চীৎকারের মধ্যে সভাপতির মঞ্চ কাৎ হয়ে দড়াম ক'রে আমি সেই ভীড়ের মাঝখানে ভাঙা তক্তা, টুল, ফুলের মালা, কাঠের টেবিল আর দড়ি-টড়ি জড়িয়ে আছাড় খেয়ে পড়লুম।
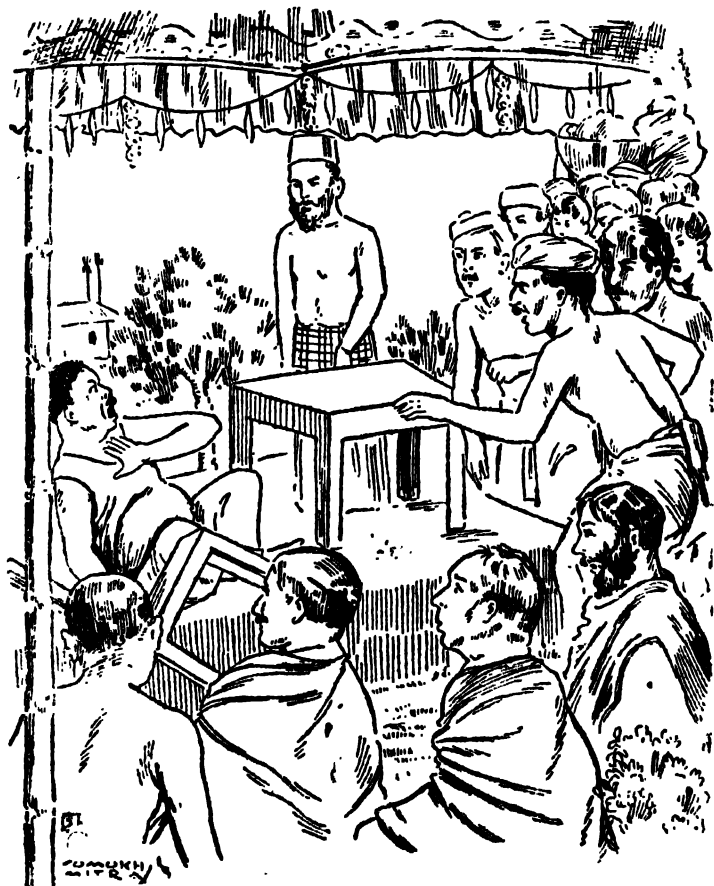
সভাপতি কাৎ হয়ে দড়াম ক'রে পড়লেন।

চারিদিকে চীৎকার, কোলাহল, কচিছেলের কান্না, দুমদাম শব্দ,—এদের মাঝখান থেকে যখন ভাঙা তক্তা আর টুল সরিয়ে আহত অবস্থায় আমাকে তোলা হোলো, তখন আমার কপাল কেটে রক্ত ঝরছে, নাক চেপ্টে গেছে, পা খোঁড়া হয়েছে। আমি অজ্ঞান হইনি, কারণ চেয়ে দেখলুম একজন কদাকার লোক একমুঠো ঘাস মুখে চিবিয়ে আমার কপাল আর মুখের ওপর রক্ত বন্ধকরার জন্য থেব্‌ড়ে দিল।

অত গোলমাল আর দাপাদাপিতে আলো নিভে গিয়েছিল, আর সেই অন্ধকারে নৌকার মাঝিটা কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে।

আমাকে সেই গোলপাতার ঘরে এনে শুশ্রূষা ক'রে বাতাস দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে সবাই যখন বিদায় নিল, তখন অনেক রাত। কষ্টে, অপমানে আর উৎপীড়নে আমার সর্ব্বাঙ্গ যেন অবশ। এদিকে ভীষণ মশার কামড়ে আমি পাগলের মতো এক সময় উঠে বসলুম। এযাত্রা পৈতৃক প্রাণটা বুঝি আর থাকে না। এই ভয়ানক সাহিত্য সম্মেলন থেকে কেমন ক'রে মুক্তি পাবো তাই ভেবে আস্তে আস্তে উঠে দরজা খুললুম। চতুর্দ্দিক অন্ধকার। কিন্তু আর না, যেমন ক'রেই হোক, ভোর হবার আগে এদেশ থেকে পালাতেই হবে। হে ভগবান!

কিন্তু অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে আমি আমার কোনো জিনিষপত্রই খুঁজে পেলুম না। কাপড় জামা, সুটকেশ, চাদর—কোথাও কিছু নেই। তৎক্ষণাৎ বুঝলাম সমস্তই চুরি হয়ে গেছে, আর আমার কিছু নেই। হাতড়ে হাতড়ে দেখি, কেবল আমার গামছাখানা এক পাশে প'ড়ে রয়েছে। সেই গামছাখানাই কোমরে বেঁধে তুর্গা বলে সেই ভীষণ অন্ধকারে আমি পা টিপে টিপে পথে বেরিয়ে পড়লুম। নদীর পথটা চিনে চিনে যখন অনেকদূর এসে পড়েছি তখন এক সময় অনুভব করলুম আমার পিছনে পিছনে আসছে এক ছায়া-মূর্ত্তি। ভয়ে আমার গলা শুকিয়ে এলো, আমি হন্ হন্ ক'রে এগিয়ে চললুম। কিন্তু সেই ছায়ামূর্ত্তি আমাকে ছাড়লো না, সঙ্গে সঙ্গে নির্জ্জন নদীর ধার পর্য্যন্ত এসে এক সময় ডাকলে, ওহে কর্ত্তামশাই।

বললাম, কে হে তুমি?

সে কাছে এলো। বললে, গা ঢাকা দিয়ে পালাচ্ছ যে? ওসব হবে না, আমার নৌকা ভাড়া দাও।

এ সেই মাঝি! লোকটা এখনও আমাকে ছাড়েনি, বরাবর আমার ওপর লক্ষ্য রেখেছে। বললুম, দেবো ভাই, আগে আমাকে পার ক'রে দাও।

সে বললে, ওসব হবে না। আগে দাম চাই।

আমি তার হাতে একটা টাকা দিলুম। সে বললে, ওসব হবেনা, আর একটাকা দাও, তোমার জন্যে আমি তখন অত মার খেয়েছি।

তার হাতে আর একটাকা দিতে তবে সে আমাকে নৌকায় তুললে। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কল্‌কাতার গাড়ী কখন্ ছাড়ে জানো ভাই মাঝি?

মাঝি বললে, ভোর রাতে।

আমাকে ঠিক পৌঁছে দিতে পারবে ত?

বক্‌শিশ পেলে পারি।

আচ্ছা দেবো, শীঘ্র চলো।

মাঝি বললে, ওসব হবে না আগে দাও। তোমাকে বিশ্বাস নেই।

তখন নিরুপায় হয়ে আমার কাছে যা কিছু টাকা পয়সা ছিল সব তার হাতে তুলে দিলুম। কেবল রিটার্ন্ টিকিটখানা সঙ্গে রইল।

ওপারে গিয়ে নৌকা ভেড়াবার আগে মাঝি বললে, দাও এবার বক্‌শিশ?

ওই ত দিলুম হে।

ওটা ত' ভাড়া, বক্‌শিশ কই? না দিলে আমি নৌকা ভেড়াবোনা বলছি। এখানে গলা ফাটালেও কেউ শুনবে না।

কি চাও বলো ?

গায়ের জামাটা আর গামছাখানা—

ভীত দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে জামা ও গামছা খুলে তার হাতে দিলুম। এবার মাঝি নদীর ধারে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে বললে, তুমি কিছু দিতে জানো না তাই সবাই কেড়ে নিলে। যাও, ঐ-ই যে ষ্টেশন্ দেখা যাচ্ছে।

আমি সর্ব্বস্বান্ত,—আর কোথাও কিছু আমার নেই। ক্লান্ত ও অবসন্ন দেহে মাঝির শেষ কথাটা ভাবতে ভাবতে ষ্টেশনের দিকে চলতে লাগলুম।

সে অনেক কালের কথা। তখন এই কলকাতা শহরও এমন ছিল না। এই ট্রাম-বাস-বিদ্যুতের আলো-টেলিফোন কিছুই ছিল না। বড়লোকের বাড়ীতে তখন গ্যাসের আলো জ্বলত, আর ঘোড়ায় টানত ট্রাম। অত পুরোনো কালের কথা কি তোমাদের ভালো লাগবে? তবু বলি।

সেই কালে, অর্থাৎ আজ থেকে চল্লিশ বৎসরেরও কিছু বেশী আগে আমাদের গ্রাম থেকে আমরা তিনটি ছেলে প্রত্যহ চার মাইল দূরের স্কুলে গিয়ে লেখা পড়া শিখতাম। বর্ষায়, গ্রীষ্মে, শীতে, কোনদিন বিরাম ছিল না। এর অর্থ যে কী সে

তোমরা সবাই বুঝবে না। কিন্তু চার মাইলের মধ্যে স্কুল নেই এমন গ্রাম আজও হয়তো আছে। সেই সব গ্রামের ছেলেরা আজও হয়তো প্রচণ্ড গ্রীষ্মে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে, শীতে কাঁপতে কাঁপতে প্রত্যহ আট মাইল রাস্তা হেঁটে মা-সরস্বতীর করুণা আকর্ষণ করে। আমাদের দুঃখের কথা একমাত্র তারাই বুঝতে পারবে।

পিছনের সেই দিনগুলোর কথা যখন ভাবি তখন আজও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। ভীরু, অলস, অকর্ম্মণ্য বলে বাঙ্গালীর বদনাম আছে। তার কিছুটা হয়তো সত্যি। কিন্তু বাকিটা যে কত বড় মিথ্যে সে আমি আমার এই পঞ্চাশ বছরের অভিজ্ঞতায় ভালো ক'রেই জেনেছি। বাঙ্গালী আফ্রিকার সোনার খনির সন্ধানে যায়নি, মেরু রাজ্যে অভিযান করেনি,প্রশান্ত মহাসাগরে হাঙ্গরের সঙ্গে লড়াই করেনি সত্যি। কিন্তু এর জন্যে কতটা দায়ী আমরা নিজে, আর কতটা দায়ী আমাদের পরাধীনতা সে একটা ভাববার কথা। তবে সে যে সাহসের অভাবে, কিম্বা দুঃখ সইবার ভয়ে নয় তার প্রমাণে এই কথা বলা যেতে পারে, চাকরীর জন্যেই হোক, আর লেখাপড়া শেখবার জন্যেই হোক, আর অন্য যে কোনো কারণেই হোক, বাঙ্গালী একক, অসহায় এবং নির্বান্ধব যায়নি কোথাও? পৃথিবী ভ্রমণকালে কত

অপ্রত্যাশিত জায়গায় বঙ্গালীর দেখা পেয়ে যে আমি অবাক হয়ে গেছি, তার ইয়ত্তা নেই।

নিজেদের ছেলেবেলার কথাই বলি। সেই নিতান্ত বালক-কালেই বিদ্যাশিক্ষার জন্যে কি আমরা কম কষ্ট সহ্য করেছি? শীতে সন্ধ্যায় বাড়ী ফেরার পথে মাঠের হাওয়ায় সর্ব্বাঙ্গ অবশ হয়ে গেছে। গ্রীষ্মের প্রখর রোদে মাথার উপরে জীর্ণ ছাতা এবং পায়ের তলার কঠিন মাটি তেতে আগুন হয়েছে; সেই তেপান্তর মাঠে কোথাও ছায়ার চিহ্ন পাইনি। আর বর্ষায় সেই নির্জ্জন প্রান্তরে মুষল ধারে বৃষ্টি নেমেছে তীরের মতো তীক্ষ্ণ, মেঘ ডেকেছে, বিদ্যুৎ ঝলসেছে, বাজ পড়েছে,—সে যে কী ভয়ঙ্কর, অনভিজ্ঞ লোক বুঝবে না।

এমনি ক'রে আমরা তিনটি ছেলে একদা বাণী লক্ষ্মীর আরাধনা করেছিলাম। সেই তিন জনের একজন আজ স্যার হরিপ্রিয় গুপ্ত; ক'লকাতার একজন বিশিষ্ট ধনী, এবং হাইকোর্টের একজন নামজাদা উকিল। আর একজন আমি বরদা মিত্তির। খ্যাতি পাইনি, বাণীর সাধনাতেও সিদ্ধ হইনি, কিন্তু লক্ষ্মীর প্রসাদ পেয়েছি। তৃতীয় ব্যক্তি সুরদেব মুখুয্যে। তার কথা তোমারা কেউ জান না, এই গল্প না পড়লে হয়তো তার নামও শুনতে পেতে না। অথচ আমাদের তিনজনের

মধ্যে কি প্রতিভায়, কি চরিত্রে এবং কি অন্তরের মাধুর্য্যে তার সমকক্ষ কেউ ছিল না।

কে জানে সে এখন কেমন আছে, কোথায় আছে, আদৌ বেঁচে আছে কি না।

খ্যাতি, অর্থ ও প্রতিপত্তির লোভে সমস্ত যৌবনটা অন্ততঃ আমরা দুজনে, হরিপ্রিয় ও আমি প্রচণ্ড বেগে ঘুরলাম। বিশ্রামের অবকাশ পাইনি। সেই উল্কাবেগ আজ জীবনের প্রান্তসীমায় এসে ঢিলা হয়েছে। ওখানে হরিপ্রিয়, এখানে আমি, কাছাকাছিই আছি। তবু দেখা হয়েছে এত অল্পবার এত অল্প সময়ের জন্যে যে দেখা হয়নি বললেই চলে।

আজকে কাজের চাপ কমেছে, তাড়া কোথাও নেই। এইখান থেকে এইখানে হরিপ্রিয়র বাড়ী। অনেক দিন থেকেই ভাবছি তার খবরটা একবার নিয়ে আসব। কিন্তু এমনি অনভ্যাস যে, এই একটা মাসের মধ্যে তারও একদিন সময় হয়ে উঠল না।

হরিপ্রিয় অবশ্য ঠিক আমার মতো নয়। সে সাহেব মানুষ। আজকে তার লাটের ডিনার, কালকে পেলিটিতে লাঞ্চ, তার পরদিন হয়তো বা সাঁতারের পুরস্কার বিতরণ।

হাইকোর্টের কাজ কমিয়ে আনলেও এই কাজগুলো তার বেড়েছে। আমার মতো অখণ্ড অবসর তার হয়নি।

স্থির করেছি, একটা ছুটির দিনে আগে থেকে তাকে ফোন ক'রে রেখে একটা গোটা সন্ধ্যা সেইখানে কাটাব।

ইত্যবসরে একদিন সন্ধ্যায় তারই কাছ থেকে জরুরী তলব এল, শিগ্‌গির এস। আশ্চর্য্য খবর আছে। বাড়ীতে বলে এস, এইখানেই রাত্রে তুমি খাবে, হয়তো শোবেও।

—সে আবার কি ?

—সেই রকমই ব্যাপার। এস তো। এলেই দেখতে পাবে।

—আচ্ছা যাচ্ছি।

মনে মনে অবাক হলাম। হরিপ্রিয়র বাড়ীতে নিমন্ত্রণ অনেক খেয়েছি। কিন্তু শোবার নিমন্ত্রণ কখনও পাইনি। এমন কী তার কথা থাকতে পারে যা দু'এক ঘণ্টায় শেষ হবে না, সমস্ত রাত লাগবে বুঝে পেলাম না।

ভাবতে ভাবতে ওর ওখানে গেলাম।

ওর বাড়ীর সমস্তই আমার পরিচিত। নীচে বেয়ারা বললে, সাহেব তেতলায় রয়েছে, যান।

হরিপ্রিয়কে তার বাড়ীর চাকর-বাকর যখন সাহেব বলে,

আমার হাসি আসে। পোষাকে-পরিচ্ছদে, চালে-চলনে, আদব-কায়দায়, এমন কি বাসের ব্যবস্থাতেও হরিপ্রিয় সাহেব। তবু সে যে সত্যি সত্যি সাহেব নয়, বাঙ্গালী যে সত্যিকার সাহেব হতেই পারে না, সে কথা চাকরে তো জানে না।

'আমি যখন দোতলা থেকে তেতলায় উঠছি, তখন দেখি হরিপ্রিয়র স্ত্রী ব্যস্তভাবে তেতলা থেকে নেমে আসছেন।

আমাকে দেখে হাসতে হাসতে বললেন, তেতলার বড় বারান্দায় আছেন। যান।

—কি ব্যাপার বলুন তো ? জরুরী তলব কেন ?

—গেলেই দেখতে পাবেন। আপনার জন্যে একটা surprise অপেক্ষা ক'রে আছে।

উপরে উঠে যা দেখলাম, তাতে সত্যিই আমার বিস্ময়ের অবধি রইল না।

বারান্দায় ছ'খানা বড় মাছুর বিছানো। আর সেইখানে খালি গায়ে শুয়ে হরিপ্রিয় আর একটি লোকের সঙ্গে খুব হেসে হেসে গল্প করছে। এক নজরে লোকটিকে পরিচিত ব'লে বোধ হ'ল না। অতি হা'ঘরে চেহারা। গায়ের রং হয়তো এককালে বেশ ফর্সাই ছিল, কিন্তু রোদে-বৃষ্টিতে তামাটে হয়ে গেছে। মুখখানি জরাজীর্ণ দেহেরই

মতো শীর্ণ। তার উপর খোঁচা-খোঁচা কাঁচা পাকা দাড়িতে আরও শীর্ণ দেখাচ্ছে।

তাঁর দিকে এক নজর চেয়ে আমি হরিপ্রিয়কে বিস্মিত-ভাবে বললাম, এ কি হে! খোলা গায়ে, মাদুরের ওপর!

হরিপ্রিয় হো হো ক'রে হেসে বললে, আশ্চর্য্য হচ্ছ? কিন্তু এই ভদ্রলোককে চিনতে পার?

এবারে তার দিকে ভালো ক'রে চাইলাম।

চিনি-চিনি মনে হ'ল। বিশেষ চোখ দুটি। আর শিশু-সুলভ ঠোঁটের গড়ন।

কিন্তু···

অস্ফুটস্বরে কুণ্ঠিতভাবে বললাম, সুরদেব!

সুরদেব উল্লাসের সঙ্গে তড়াক ক'রে লাফিয়ে উঠে আমার করমর্দ্দন ক'রে বললে, সাধু, সাধু! দেখছি এখনও আমাকে ভোলোনি। এ একটা সৌভাগ্য।

—তোর চেহারা এ কি হয়েছে সুরো!

উত্তরে সুরদেব শুধু একটু হাসলে।

হরিপ্রিয় আমাদের দুজনের হাত ধরে টেনে বসিয়ে বললে, ব'সে যা, ব'সে যা। মুড়ি আসছে।

—মুড়ি!

—হুঁ। এ বাড়ীতে মুড়ি। সুরোটার জন্যে সাহেবের

মান-মর্য্যাদা আর রইল না। এ পাড়াতে মুড়ি বোধ হয় পাওয়া যায় না। গাড়ী পাঠিয়েছি, যেখান থেকে হোক নিয়ে আসবে এখন। মাদুর ছিল না, তাও আনিয়েছি। কিন্তু ছেঁড়া বালিশ কোথায় বিক্রি হয় বল্ দেখি।

—ছেঁড়া বালিশ কি হবে?

—এইখানে তিনজনে মাথায় দিয়ে শোব, সেই ছেলে-বেলাকার মতো।

হয় তো ছেলেবেলার দিনগুলির কথায় হরিপ্রিয়র চোখে জল এল। কোঁচার খুঁটে চোখ মুছে আমাকে একটা ঠেলা দিয়ে বললে, ব্যাপার দেখে বয়গুলো মুখ টিপে হাসছে জানিস?

বললাম, তোর যত অনাসৃষ্টি?

—অনাসৃষ্টি! এই অনাসৃষ্টির মধ্যেই আমাদের জীবনের আরম্ভ বন্ধু। ওরই জন্যে আমার মন আজ পাগল হয়েছে। বড় কাজ অনেক করেছি, বড় কথা অনেক শুনেছি। আজ সারা রাত এইখানে শুয়ে সুরোর কাছ থেকে ছোট কাজ আর ছোট কথার গল্প শুনব স্থির করেছি।

সত্যি সত্যিই মুড়ি এল। আদা-কুচি পেঁয়াজ-কুচি, লঙ্কা-কুচি নারকোল-কুচি বাদাম ভাজা দিয়ে মুড়ি।

হরিপ্রিয়র স্ত্রী নিজে হাতে একখানা বড় থালায় ক'রে নিয়ে এলেন। ব্যবস্থা দেখে আমরা সমস্বরে বলে উঠলাম বাঃ!
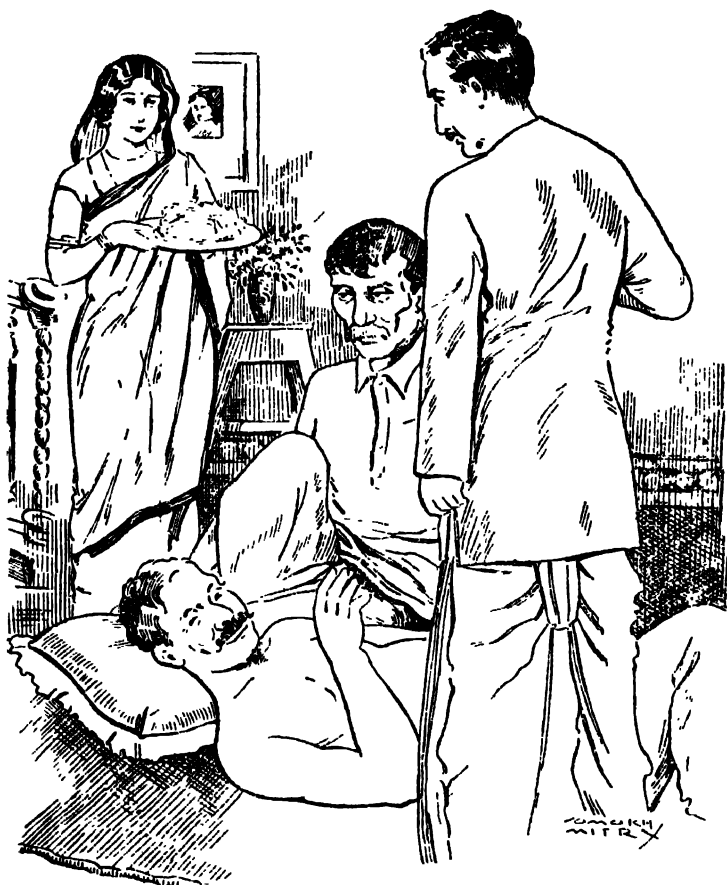
হরিপ্রিয়র স্ত্রী নিজে হাতে একখানা বড় থালায় ক'রে নিয়ে এলেন।

রাত্রের খাওয়ার ব্যবস্থাও সম্পূর্ণ দেশী মতে হ'ল, যে জিনিস ছেলেবেলায় আমরা পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে খেতাম এবং যার আস্বাদ আজ ভুলেই গেছি।

আহারান্তে সত্যিই আমরা সেই বারান্দায় মাদুরের উপর শুয়ে পড়লাম, সেই ছেলেবেলার মতো অন্তরঙ্গ হয়ে।

বললাম, বল সুরো, এইবার তোর কি কথা আছে।

—কোন খান থেকে শুনতে চাস?

—এম-এতে ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট হয়ে সেই যে ঢাকা না কোথায় প্রোফেসারি নিয়ে গেলি, তার পর থেকে আর তোর কোনো খবর জানি না।

—ঢাকায় না বহরমপুরে।

—তাই হবে। সেখান থেকে কোথায় ডুব দিলি বল।

—সেখান থেকে রামকৃষ্ণ মিশনে দশ বছর। তার পরে বছর ছয়েক সরকারী জেলে।

—জেলে!

—জেলে।

—জেলে কি জন্যে? পেতলকে সোনা করতে যাসনি তো?

—অনেকটা। কিন্তু পেতলকে নয়, সোনাকেই সোনা করতে গিয়েছিলাম।

সুরদেব হাসলো।

হরিপ্রিয় উৎকণ্ঠার সঙ্গে বললে, তবে কি স্বদেশী করতে গিয়েছিলি নাকি? সর্ব্বনাশ করেছিস!

সুরদেব এবারে জোরে জোরেই হেসে ফেললে। বললে, কেন রে, তাহ'লে তোর স্যার উপাধি কেড়ে নেবে নাকি?

ভিতরে ভিতরে আমার উৎকণ্ঠাও কম হচ্ছিল না। সরকারী কনট্রাক্টের কল্যাণে আমার এই ঐশ্বর্য্য। কাল যদি জানাজানি হয়, একটা রাত্রি আমি স্বদেশী বাবুর সঙ্গে কাটিয়েছি, চাই কি পরশু থেকেই সমস্ত কনট্রাক্ট বন্ধ হয়ে যেতে পারে। তখন অত বড় কারবার, অত বড় বাড়ী, প্রত্যেক ছেলের একখানা ক'রে মোটর, কোথায় থাকবে এ সব!

তবু বড় ভালো লাগছিল সুরদেবকে। ওর মধ্যে কি যেন একটা দীপ্তি আছে। সে দীপ্তি আগুনের নয়, হীরার। তা পোড়ায় না, শুধু আলো দেয়।

হরিপ্রিয় গম্ভীরভাবে বললে, ও সব বুদ্ধি ছেড়ে দাও সুরদেব। বিয়ে-থা করনি, সে তো বোঝাই যাচ্ছে। তাহ'লেও ভদ্র জীবন-যাপনের এখনও দরকার শেষ হয়নি। আমি এখানকার একটা কলেজের গভর্ণিং বডিতে আছি। যদি বল,

সেখানে তোমার জন্য একটা প্রোফেসারী অক্লেশে জুটিয়ে দিতে পারি।

হরিপ্রিয় জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলে। তার মুখের 'তুই' সম্বোধন 'তুমি'তে নেমে এসেছে।

সুরদেব এবারে অত্যন্ত ম্লানভাবে হাসলে। বললে, প্রোফেসারী? আনন্দ পাইনি ব'লে ও তো আমি ছেড়েই দিয়ে এসেছি। তা নয় বন্ধু, শোন! নোয়াখালি জেলার একটি অখ্যাত, দুর্গম গ্রামে আমি একটি ছোট আশ্রম খুলেছি। তাব সঙ্গে একটি স্কুলও খুলেছি। সেখানে অত্যন্ত দুঃস্থ নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমান ছেলেরা পড়ে। গেল পাঁচ বছরে সেই ছোট আশ্রমটি এখন অনেক বড় হয়েছে। তারই অর্থ ভিক্ষায় আমি বেরিয়েছি।

একটু ভেবে সুরদেব বললে, পথে তোমার কথা মনে হ'ল। ভাবলাম, ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে তোমার অর্থের অপ্রতুল নেই। আমার দরকার হাজার পাঁচেক টাকার বেশী নয়। এই টাকাটা তুমি একলাই দিয়ে দিতে পার।

স্যার হরিপ্রিয়ের মুখ এবারে কঠিন হয়ে উঠল। বললে, পারি। ওর চেয়ে অনেক, অনেক বেশী পারি, তোমার জন্যে। তুমি প্রোফেসারী নাও, বাউণ্ডুলী ছাড়। এখানে তোমার বাড়ী ক'রে দিচ্ছি গাড়ী ক'রে দিচ্ছি। ভদ্রভাবে আমাদের

বন্ধুর মতো থাকবার জন্যে তোমার যা কিছু দরকার সব দিচ্ছি কিন্তু নোয়াখালির সেই দুর্গম গ্রামে আশ্রমের জন্যে একটি পয়সাও দিতে পারব না।

সুরদেব নিঃশব্দে সমস্ত শুনলে। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, তোমার এই বন্ধুত্ব আমি চির দিন মনে রাখব। কিন্তু,—সুরদেব হাসলে, তার ছেলেবেলার সেই আশ্চর্য্য হাসি,—আমার নিজের জন্যে এ সংসারে কিছুরই প্রয়োজন নেই।

হরিপ্রিয় আরও কঠিন কণ্ঠে বললে, কিন্তু তাহ'লে তোমাকে আমাদের বন্ধু ব'লে পরিচয় দোব কি ক'রে?

—বন্ধু ব'লে?—সুরদেব আবার তেমনি ক'রে হাসলে,—নাই দিলে সে পরিচয়। যদি কখনও আবশ্যকই হয়, বোলো আমি তোমাদের সেবক। এবারে ঘুমোও ভাই, বড় ঘুম পাচ্ছে। দু'দিন কখনও নৌকোয় কখনও ট্রেনে। ভয়ানক ক্লান্ত।

দেখতে দেখতে সুরদেব নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে লাগল। একটু পরেই হরিপ্রিয়েরও নাক ডাকতে লাগল। কেবল কি জানি কেন, আমারই চোখে ঘুম এল না। সভ্যতার লীলানিকেতন ক'লকাতার এই বিলাসপুরী থেকে নোয়া-খালির সেই দুর্গম গ্রাম আমি কল্পনাও করতে পারছিলাম না।

তার বনে কত বাঘ আছে, ঘরের মধ্যে মেঝের নীচে কত সাপ আছে, জলা মাঠে কত জোঁক আছে, কে বলবে? বানে হয়তো সব ডুবে যায়, তখন সাপে-মানুষে-বাঘে একত্র বাস করে। সেখানে হয়তো ডাক্তার নেই, কবিরাজ নেই, কিছুই নেই। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এই কৃতি সন্তান জীবনের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা বিসর্জ্জন দিয়ে কিসের লোভে সেই ভয়ঙ্কর দেশে প'ড়ে আছে কে জানে।

মনে হ'ল, বাড়ী-গাড়ী-টাকা-পয়সা যা কিছু আছে, এরই হাতে সব বিলিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হই।

কিন্তু কেমন যেন লজ্জা করে।

*　　　*　　　*

ভোর বেলায় উঠে দেখলাম, হরিপ্রিয় তখনও অঘোরে নিদ্রা যাচ্ছে। সুরদেব নেই। তাকে আর পাওয়া গেল না।

কোথায় গেছে কে জানে।

হয় তো এই কলকাতা সহরেই পথে পথে ভিক্ষা করছে। নয়তো আবার নোয়াখালির সেই অজ্ঞাত অখ্যাত গ্রামেই ফিরে গেছে।

বিকেলবেলা চুপচাপ ব'সে-ব'সে গল্পের প্লট ভাবছি, এমন সময় একটি ভদ্রলোক ঘরের মধ্যে এসে উপস্থিত। মস্ত লম্বা চওড়া চেহারা, কুঁচোনো ফরেসডাঙার ধুতি আর গরদের পাঞ্জাবি পরনে। আমি শশব্যস্ত হ'য়ে বললুম, 'আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারছি না।'

আগন্তুক এক গাল হেসে বললেন, 'আজ্ঞে আমি আপনার ছাত্র ছিলুম—'

চম্‌কে উঠলুম। একবার ভদ্রলোকটির মুখের দিকে, আর-একবার তাঁর চকচকে পেটেণ্ট পম্পের দিকে তাকিয়ে বললুম, 'ও। তা—'

'আপনার সঙ্গে একটু দরকার ছিলো।'

সাহসে বুক বেঁধে বললুম, 'বোসো।' 'তুমি' বলতে জিভে আটকে আসছিলো, জোর ক'রে দুর্বলতা কাটিয়ে উঠলুম। এই সুবেশ সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকটি আমার পুরোনো ছাত্র, কথাটা ভাবতে একটু গর্বও হচ্ছিলো মনে। অবশ্য কবে যে এঁকে পড়িয়েছি তা মনে করতে পারলুম না—তা'তে অবাকও হলুম না, কেন না প্রতি বছর হাজার দুই ক'রে ছেলে পড়াতে হ'লে তাদের মুখ মনে রাখবার চেষ্টা শেষ পর্যন্ত ছেড়েই দিতে হয়।

ভদ্রলোকটি—'ছেলেটি' বলতে পারলে খুসি হতুম, কিন্তু ভেবে দেখছি কথাটা বড্ডই বেমানান হয়—একটা চেয়ারে ব'সে বললেন, 'আপনার কি একটা সভায় যাওয়ার সময় হবে?'

তৎক্ষণাৎ ব'লে ফেললুম, 'আজকাল আমার শরীরটা মোটেই—'

'আপনি যা ভাবছেন, তা নয়। কোনো সাহিত্যসভা নয়। সম্পূর্ণ নতুন ধরণের সভা। আপনি বোধ হয় শুনেছেন যে সম্প্রতি কলকাতায় একটা প্লকৃড্ ষ্টুডেন্টস্ লীগ হয়েছে।'

'অ্যাঁ? কী হয়েছে?'

'ফেল করা ছাত্রদের একটা লীগ হয়েছে। মাস ছয়েকের

মধ্যেই আমরা এক হাজার মেম্বার পেয়েছি। রোজই নতুন নতুন মেম্বর হচ্ছে—পূজার মধ্যে দু'হাজার হ'য়ে যাবে। আমি এই লীগের সেক্রেটারি।' ভদ্রলোকটি সবিনয়ে একটু হাসলেন।

আমি গম্ভীরভাবে বললুম, 'এই লীগের উদ্দেশ্য কী?'

'উদ্দেশ্য ফেল-করা ছাত্রদের সুখ সুবিধে দেখা, তাদের রাইট্‌স্ প্রোটেক্ট করা, এক্সপ্লয়টেশন থামানো—'

এই পর্যন্ত শুনেই আমি বললুম, 'বুঝেছি। যাতে তারা ভবিষ্যতে আর ফেল না করে, তারই ব্যবস্থা করা—এই তো।'

আমার কথা শুনে ভদ্রলোক যেন বিহ্বলভাবে আমার মুখের দিকে একটু তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন—'না, সে-রকম কিছু নয়। এটা ফেল করা ছাত্রদের লীগ, পাশ করলে তো সঙ্গে-সঙ্গেই মেম্বারশিপ নাকচ হ'য়ে গেলো। আপনি বুঝি ভাবছেন ফেল করাটা খুব সোজা? তা নয়, ফেল করাটা দস্তুরমতো একটা ফাইন আর্ট। এই ধরুন না, ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ফেল করার মতো শক্ত আর কী হ'তে পারে? আপনিই বলুন! তারপর আমাদের যিনি অনারারি ট্রেজারার, তিনি এম-এ ফেল। এম্-এ ফেল শুনেছেন কখনো? না—তিনি আধখানা পরীক্ষা দিয়ে উঠে

আসেন নি; সবগুলো পেপার দিয়েছিলেন, এবং সবগুলো প্রশ্নেরই জবাব লিখেছিলেন। তবু তিনি ফেল করলেন। ভাবতে পারেন! অসাধারণ লোক! সত্যিকারের উঁচুদরের আর্টিষ্ট। আমাদের লীগে এই ধরণের খাঁটি লোক মাত্র শ' দুয়েক—আর সব বাজে মাল, কেউ অসুখ ক'রে, কেউ খামোকা, কেউ গাফিলি ক'রে ফেল করেছে—তারা আজ আছে কাল নেই—তাদের আমরা বিশেষ আমলে আনিনে, তবে মেম্বর হ'তে চায় হচ্ছে, বছরের চাঁদাটা তো পাওয়া যায়।

রোমাঞ্চিত হ'য়ে বললুম, যারা কেবলই ফেল করে, অর্থাৎ ফেল করার কায়দাটা যারা নির্ভুল জানে, আসলে তাদের জন্যেই বুঝি তোমাদের এই সভা?'

'ঠিক বুঝেছেন, স্যর। আপনাকে বলতে বাধা নেই, আমার সম্বন্ধে আমাদের এক্সিকিউটিভ কমিটি বেশ একটু উঁচু ধারণাই পোষণ করে। তিন বারের বার ম্যাট্রিক পাশ করি। তারপর গেল আট বছর ধ'রে আই-এ ফেল করছি। এটা কিন্তু, স্যর, রেকর্ড নয়। আমাদের একজন বড়ো দরের পেট্রন আছেন—কাঠের কারবারে বেশ দু' পয়সা করেছেন—তিনি আই-এ ফেল করেছিলেন সতেরোবার। এ-সব খবর তো আর কাগজে বেরোয় না—লোকে কিছু খোঁজ-খবরও

রাখে না—কিন্তু আমরা খুব ভাল ক'রে খোঁজ নিয়ে জেনেছি যে ইণ্ডিয়া, বর্মা ও সীলোনের মধ্যে এখন পর্যন্ত তাঁরই রেকর্ড। একবার খাটমুণ্ডু থেকে এক নেপালির খোঁজ পাওয়া গেলো—সে নাকি উনিশবার ম্যাট্রিক ফেল করেছে—'

আমি ব'লে উঠলুম, 'বলো কী! সত্যি?'

'পাগল হয়েছেন! বুজরুকি। স্রেফ বুজরুকি। আমরা খুব ভালো ক'রে খোঁজ নিয়ে দেখলুম, সে পাঁচ বারের বেশি পরীক্ষাই দেয়নি! জোচ্চোর আর কি লোকটা।'

আমি বললুম, 'একদিন হয়তো রেকর্ডটা তুমিই কেড়ে নেবে।'

ভদ্রলোকটির মুখে ছায়া পড়লো। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'নাঃ, সে-রকম আশা তো দেখিনে। প্রথমে আপনাদের কলেজ থেকে পরীক্ষা দিই—সেবারেই প্রায় পাশ ক'রে ফেলেছিলুম আর কি! উঃ! ভাগ্যিস ইংরিজিতে চার নম্বর শর্ট ছিলো। সেখান থেকে গেলুম বঙ্গবাসী, সেবারে মাতৃভাষা আমাকে উদ্ধার করলো। বাংলায় ফেল না করলে সেবারেও নির্ঘাৎ পাশ ক'রে যেতুম। নেহাৎ কপাল ভালো—তাই। তারপর বিদ্যাসাগর, সেণ্টপল্স্, স্কটিশ···কলেজ বাকি রাখিনি, স্যর, এখন আর ভালোও লাগে না। আর সব বাচ্চা-কাচ্চা প্রফেসরের কাছে পড়া—লজ্জাও করে।' শেষের

কথাটি ব'লে ভদ্রলোক আড়চোখে একবার আমার মুখের দিকে তাকালেন, আমি বুঝতে পারলুম, আমার মুখ ঈষৎ লাল হ'য়ে উঠলো।

শেষের কথাটি ব'লে ভদ্রলোক আড়চোখে একবার আমার দিকে চাইলেন।

বললুম, 'সে তো ঠিকই। লজ্জা তো করতেই পারে।

তা এই জন্যেই বোধ হয় ইউনিভার্সিটি নতুন নিয়ম ক'রে দিলো যে ফেল-করা ছেলেদের আর ক্লাশ করতে হবে না।'

'ইউনিভার্সিটির কথা আর বলবেন না, স্যর—অবিচার, অত্যাচার যা চলেছে সে আর বলবার নয়। কিন্তু আমাদের কথা কি কেউ ভাবে! সেইজন্যেই তো আমাদের এই লীগ। আর-কিছু না হোক, পাব্‌লিকের কাছে আমাদের সুখদুঃখের কথা তো বলতে পারবো। ভালো পাশ করলে মেডেল, প্রাইজ, স্কলারশিপ, কত কী—কিন্তু আমাদের কাঠের কারবারি শিবশঙ্করবাবু যে সতেরোবার আই-এ ফেল করলেন, ইউনিভার্সিটির কি উচিত ছিলো না তাঁকে কিছু সম্মান দেখানো! কিচ্ছু না, টুঁ শব্দটি নেই। ফেল করা যে, একটা ফাইন আর্ট সে বিষয়ে এই ইউনিসার্সিটির কোনো ধারণা আছে নাকি! শিবশঙ্করবাবু তো প্রায় জিনিয়স। আপনাকে আর বলবো কী, স্যর, আপনি তো সবই জানেন— এ-সব পরীক্ষায় পাশ করতে কি বিদ্যে লাগে, না বুদ্ধি লাগে! চোখের উপরেই তো এতদিন দেখলুম—যত সব হাবা, হাঁদা, গাধা সেরেফ নোট মুখস্ত ক'রে বি-এ, পাশ ক'রে যাচ্ছে, ইউনিভার্সিটি তাদেরও তো ডিগ্রি দিচ্ছে! একবার ভাবছে না যে চাকরীর জন্যে একটা দরখাস্ত লেখবার মতো বিদ্যেও এদের নেই। অথচ যারা বছরের পর বছর ফেল করছে,

তাদের মধ্যে অনেকের রীতিমতো ওরিজিনাল মাইণ্ড, আর মানুষও তারা উঁচু দরের, নিষ্কাম কর্মী, পাশের আশা না রেখে পরীক্ষা দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ইউনিভার্সিটি কখনো কি এদের কৃতিত্ব স্বীকার করে? কক্ষনো না। এ-সব দেখে-শুনে আমার ভারি মন খারাপ হ'য়ে গেছে, স্যর। ভেবে-ছিলুম শিবশঙ্করবাবুর কাছাকাছি পৌঁছতে পারবো, কিন্তু এই অবিচার আর সহ্য হয় না। তাই ভাবছি আর পরীক্ষা-টরীক্ষা না দিয়ে বাবার জুয়েলারী ব্যবসাতেই মন দেবো।'

আমি বললুম, 'সে কী কথা! এত সহজে হতাশ হ'লে চলবে কেন? আমার তো মনে হয় তোমার ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল, শিবশঙ্করবাবুর রেকর্ড তুমিই ভাঙতে পারবে।'

'নাঃ, অত উচ্চাশা আমার নেই, স্যর। এই লীগ আমার যোগ্যতা স্বীকার ক'রে আমাকে সেক্রেটারি করেছে এটুকুই যথেষ্ট। ভাবছি, বেশি উঁচুতে তো আর উঠতে পারবো না, লীগের অধম কর্মী হ'য়েই জীবন কাটাবো। আটবার ফেলও খুব বেশি নেই।'

হঠাৎ জিজ্ঞেস করলুম, 'তোমাদের লীগের প্রেসিডেণ্ট কে?'

'সেইজন্যেই তো আপনার কাছে আসা, স্যর। আপনাকে আমরা প্রেসিডেণ্ট করতে চাই।'

'আমাকে !' স্তম্ভিত হ'য়ে গেলুম।

'হ্যাঁ, আমাদের সকলেরই তাই ইচ্ছে। আপনি দয়া ক'রে রাজি হবেন, স্যর। প্রেসিডেণ্টের কিচ্ছু কাজ নেই—শুধু আপনার নামটা—'

ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে বললুম, 'কিন্তু তোমাদের সাধারণ মেম্বর হবার যোগ্যতাও তো আমার নেই। লজ্জার কথা বলবো কী তোমাকে, কোনোদিন কোনো পরীক্ষায় ফেল করিনি। শুধু একবার ইতিহাসে ফেল করবার খুব কাছাকাছি এসেছিলুম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পাশ ক'রেই গেলুম। আমার কেস্ একেবারেই হোপলেস—আমাকে এর মধ্যে নিলে তোমাদের অসম্মান হবে।'

এ-কথার উত্তরে ভদ্রলোকটি গম্ভীরভাবে বলতে লাগলেন 'সে-কথা আমরাও ভেবেছি, স্যর। কিন্তু ভেবে দেখা গেলো যে আপনার সাধারণ মেম্বর হবার যোগ্যতা না থাকলেও প্রেসিডেণ্ট আপনি অনায়াসেই হ'তে পারেন। প্রেসিডেণ্ট বাইরের লোক হ'লে দোষ হয় না—অনেক সমিতিরই তো এ-রকম হয়—আমাদের উদ্দেশ্যের প্রতি আপনার সহানুভূতি থাকলেই যথেষ্ট। আর তা যে আপনার আছে, তা আপনি না বললেও আমরা বুঝতে পারি। আপনি প্রগতিবাদী—অবিচার, অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে-কোনো সংঘ গ'ড়ে ওঠে তার

প্রতি আপনার সহানুভূতি থাকবেই। আচ্ছা, আপনিই বলুন, এই যে unequal distribution of marks এতকাল ধ'রে দেশ ভ'রে চলছে এর কি কোনো প্রতিকার নেই? কাউকে পঁচানব্বই, কাউকে তেরো নম্বর দিতে পরীক্ষকের বিবেক কি মুহূর্তের জন্যও কেঁপে ওঠে না? সকলেই আমরা সমান মাইনে দিয়েছি, সমান ফী দিয়েছি পরীক্ষার, শুধু মুনফা ভাগবাঁটোয়ারার সময় কর্তাদের এত একচোকোমি কেন? এ-অত্যাচার আমরা সইবো না, সইবো না··· এর বিরুদ্ধে লড়বো, যতদিন না সাম্য ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত করতে পারি।' বলতে-বলতে ভদ্রলোকটির গলা ঈষৎ কেঁপে উঠলো—বোধ হয় আবেগে। আমার মনে হ'লো এঁদের সভায় ইনি যে-বক্তৃতা করবেন, এখানে তারই মহড়া দিয়ে নিলেন।

আমি কিছু বললুম না; খানিক পরে ফেল-করা লীগের সেক্রেটারি আবার বললেন, 'আপনি কি মনে করেন পরীক্ষায় যারা ফর্স্ট্ হয় তাদের মধ্যে মনুষ্যরূপী গর্দভ নেই। তাছাড়া এ-ও তো আমরা জানি যে অনেক সময় ফর্স্ট্ হ'তে হ'লে কোনো-না-কোনো বড়োলোকের আত্মীয় হলেই চলে—আর-কিছু লাগে না। এ-সব অবিচার···'

আমি অত্যন্ত কঠোর হ'য়ে গিয়ে বললুম, 'ছি-ছি, এ-সব কথা বলতে নেই। এগুলো বড়োলোককে ঈর্ষার মতো

শোনায়। ঈর্ষা মহাপাপ। আশা করি তোমাদের লীগ এ-সব ক্ষুদ্রতার উপরে উঠতে পারবে। একটা মহৎ আদর্শ সামনে রাখলে—'

মহৎ আদর্শ সম্পর্কে ক্ষুদ্র একটি নীতি-উপদেশ আমার প্রাক্তন ছাত্রকে দিয়ে দিলাম। শেষ পর্যন্ত শুনে তিনি বললেন, 'স্যর, এ-সব কথা আমাকে বলা বৃথা। আপনাকে আগেই বলেছি, ফেল করাটা আমাদের মতে একটা ফাইন আর্ট। পাশ করবার জন্যে আমরা কারো পায়ে ধন্না দিচ্ছি না, শুধু দেশ জুড়ে যে-অবিচার চলছে—'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'সে তো বুঝলুম। বেশ, তোমাদের লীগের খোঁজ খবর দিয়ো মাঝে-মাঝে।'

'সে কী কথা, স্যর। আপনি যে আমাদের প্রেসিডেণ্ট। সামনের শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় আমাদের প্রথম গ্র্যাণ্ড র‍্যালি হবে ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্‌টিট্যুটে। আপনি দয়া ক'রে সেই সভার উদ্বোধন করবেন।'

'এটি আমাকে মাপ করতে হবে। আমার একেবারে সময় নেই, তাছাড়া অত বড়ো সভায় বক্তৃতা করাও আমার পক্ষে অসম্ভব।'

'কিন্তু আমরা যে বড্ড আশা করেছিলুম।'

'আমার সত্যি যাবার উপায় নেই।'

'আপনাকে আমাদের একজন sympathizer ব'লে ধরতে পারি তো ? তা'হলে অন্তত একটা মেসেজ'—

'মেসেজ-টেসেজ, ছ্যাখো, আমার একেবারে আসে না।'

'অনেক আশা ক'রে এসেছিলুম, স্যর। যা-হোক্ কিছু...'

আমি মাথা নাড়লুম।—'অত্যন্ত দুঃখিত, কিন্তু আমার একেবারেই উপায় নেই।'

'কিছু মনে করবেন না, স্যর আপনার অনেক সময় নষ্ট করলুম,' বলে ভদ্রলোক উঠলেন। 'আমাদের সভার একটা বিবরণ আপনাকে পাঠিয়ে দেব—অবশ্য কাগজেও উঠবে।'

'আশা করি তোমাদের আন্দোলনে কিছু হবে। আচ্ছা...'

ভদ্রলোকটি যতক্ষণে বিদায় হ'লেন, ততক্ষণে আমার গল্পের প্লটের খেই একেবারে হারিয়ে গেছে। ফেল-করা লীগের খবর তোমরাও এতদিনে পেয়েছ নিশ্চয়ই, এবং যাদের যথেষ্ট কোয়ালিফিকেশন আছে তারা আশা করি মেম্বর হতেও ভোলোনি।
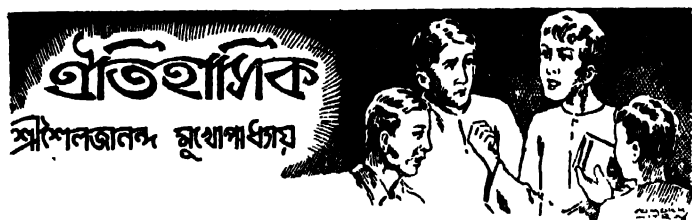
সুকুমারের ওটা মুদ্রাদোষে দাঁড়িয়ে গেছে।

কথায় কথায় বলে : 'মেরে একেবারে খুন করে' ফেলবো।'

বীরত্বের এই আস্ফালন যে করে, তার চেহারাটা অন্তত মজবুদ হওয়া দরকার। কিন্তু আঠারো বছরের এই ছেলেটি দেখতে চমৎকার হ'লে কি হবে, দূর থেকে বুকের পাঁজরা দেখা যায়, হাত পা ঠিক প্যাঁকাটির মত সরু সরু।

কাজেই ওর কথা শুনলে হাসি পাওয়া স্বাভাবিক। সবাই হাসে।

ছেলেরা যত হাসে, সুকুমারের আস্ফালন ততই যেন বেড়ে যায়। বলে : 'তোদের কাউকে আমি বাকি রাখবো না, সবাইকে মেরে' একেবারে লাট্ করে' দেবো। চুপ কর্ বলছি।'

তখন হয়ত' তারা চুপ করে না, কিন্তু একটা জায়গায় চুপ করে' তাদের থাকতেই হয়। ওই রোগা-পট্‌কা স্থকুমার যখন ইস্কুলের ক্লাসে দাঁড়িয়ে গড়্‌ গড়্‌ করে' ইতিহাসের পড়া বলতে স্থরু করে, নির্ব্বাক্‌ বিস্ময়ে সবাই তখন তার মুখের পানে তাকিয়ে থাকে!

ইতিহাসে ওর জুড়ি কেউ নেই। প্রতি বৎসর ফার্ষ্ট সে ত' হয়ই, এমন-কি ওর এক-একটা কথা শুনে ইস্কুলের টিচার পর্য্যন্ত স্তম্ভিত হয়ে যান।

আজ সবাই বলছে—অন্ধকূপ হত্যার ঘটনাটা সত্য নয় কিন্তু আঠারো বছরের স্থকুমার সেকথা অনেক আগেই বলেছিল। আমাদের এখনও মনে আছে।

স্থকুমার বলেছিল: 'সিরাজদ্দৌলা প্রাণপণে চেষ্টা করেছিলেন দেশকে রক্ষা করবার। পলাশীর যুদ্ধে ক্লাইবকে তিনি নিশ্চয়ই পরাজিত করতে পারতেন, পারলেন না শুধু মীরজাফরের ষড়যন্ত্রে।'

এগুলো অবশ্য খুব বড় বড় কথা নয়, আজ আর তার সব কথা আমার মনেও নেই, কিন্তু এখন এই বৃদ্ধ বয়সে প্রায়ই বসে বসে ভাবি—১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন বৃহস্পতিবারের বারবেলায় পলাশীর প্রাঙ্গণে ভারতবর্ষ তার যে অমূল্য সম্পদ হারিয়েছে, আঠারো বছরের বালকের মনে তার সম্বন্ধে একটা

তীব্র বেদনাবোধ নিশ্চয়ই জেগেছিল, নইলে মীরজাফরের নাম শুনলে সুকুমার এত উত্তেজিত হ'য়ে উঠতো কেন? প্রায়ই দেখতাম, পলাশীর যুদ্ধের কথা বলতে বলতে সুকুমারের চোখ-দুটো অসম্ভবরকম বড় হয়ে উঠতো, জামার আস্তিন্ গুটিয়ে, দুর্ব্বল হাতদুটি মুষ্টিবদ্ধ ক'রে বলতো: 'আমি যদি থাকতাম তখন, মীরজাফরকে একেবারে শেষ করে' দিতাম।'

সেবছর পূজোর ছুটিতে সুকুমার গেল তার মামার বাড়ী। বিধবা মায়ের ওই একটিমাত্র ছেলে সুকুমার।

মামার বাড়ী মস্ত বড়লোকের গ্রামে। পুজোর সময় যাত্রা হয়, থিয়েটার হয়,—ধূমধামের আর অন্ত থাকে না।

নবমীর রাত্রে কোথাকার কোন্ এক যাত্রার দল গাইলে 'পলাশী'র পালা। সন্ধ্যা থেকে সুকুমার বসে রইলো আসরের মাঝখানে। যাত্রা শেষ হ'লে উঠলো একেবারে সকালে।

উঠেই সে ছুটলো যাত্রার সাজঘরের দিকে। দলের অধিকারী দরজার সাম্নে বসে তামাক টানছিলেন। সুকুমার জিজ্ঞাসা করলে: 'পলাশী' বইখানা আপনি লিখেছেন?'

অধিকারী বললেন: 'কেন?'

জামার আস্তিন্ গুটিয়ে সুকুমার বললে: 'তাঁকে আমি মেরে খুন করে' ফেলবো।'

অধিকারী ভাবলেন, ছেলেটা পাগল। হাস্‌তে হাসতে বললেন: 'কেন? তিনি করেছেন কি?'

সুকুমার বললে: 'বলুন না—আপনি লিখেছেন কি-না?'

অধিকারী বললেন: 'না। তিনি কলকাতায় থাকেন।'

'তাহ'লে আর কাকে বলব?' বলে' হতাশ হ'য়ে সুকুমার চলে' আসছিল, অধিকারী বললেন: 'চলে যাচ্ছ কেন খোকা? বলে' যাও না কি হয়েছে! তাকে গিয়ে বলবো।'

ফিরে দাঁড়িয়ে সুকুমার বললে: 'সব ভুল। সব মিছে কথা!' বলেই সে চলে' এলো।

সেদিন আর কিছুই তার ভাল লাগলো না। কারও সঙ্গে ভাল করে' কথা পর্য্যন্ত সে বললে না।

সুকুমার গ্রামে ফিরলো তারও প্রায় পনেরো কুড়ি দিন পরে। দেখা গেল সেখান থেকে সে একখানি নাটক লিখে এনেছে।

ইস্কুল তখনও খোলেনি। গ্রামের সব ছেলেদের ডেকে ডেকে সুকুমার তার নাটকখানি পড়ে পড়ে শোনাতে লাগলো। কিন্তু ধৈর্য্য ধরে' শেষ পর্য্যন্ত কেউ-ই তা' শুনলে না। হেসেই সব উড়িয়ে দিলে। সে আবার নাটক লিখবে কি? নাটক লেখা অমনি মুখের কথা কি-না!

কথাটা 'হিষ্ট্রির' টিচারের কানে গিয়ে উঠলো। তিনি

একদিন সুকুমারকে ডেকে বললেন: 'কই দেখি সুকুমার, কিরকম রকম নাটক তুমি লিখেছ?'

নাটকখানি তার সঙ্গে-সঙ্গেই ফিরতো। রাফ্-খাতার তলা থেকে বাঁধানো খাতাখানি সে তৎক্ষণাৎ বের করে' দিলে!

পরের দিন মাষ্টারমশাই ছেলেদের ডেকে বললেন: 'এই 'পলাশী' নাটকখানি তোমরা অভিনয় কর। সুকুমার বেশ ভাল নাটক লিখেছে।'

এতক্ষণে ছেলেদের বিশ্বাস হ'লো।

বাবুদের বাড়ীর ছেলে হরেন হ'লো অগ্রণী। সে বললে, অভিনয়ের সমস্ত খরচ সে দেবে।'

কিন্তু পার্ট নিয়ে বাধলো গোলমাল। হরেন তার নিজের জন্যে বেছে নিলে মীরজাফরের পার্ট। শয়তানের চরিত্র হ'লে কি হবে, লেখা চমৎকার।

সুকুমার বললে, 'সে নিজে করবে সিরাজদ্দৌলার অভিনয়।'

হরেন হো হো করে' হেসে উঠলো: 'তুই করবি সিরাজের অভিনয়? ওই প্যাঁকাটির মত চেহারা নিয়ে?'

সুকুমার জেদ ধরে' বসলো—সিরাজের অভিনয় সে করবেই।

তারই লেখা বই! কিছু বলাও যায় না। অন্যান্য ছেলেরা বললে, তাই করুক্! কিন্তু হরেন বাদ সাধলে। সে কিছুতেই রাজি হ'লো না।

সুকুমার বললে: 'মেরে আমি খুন করে' ফেলবো। আমার বই নিয়ে চ'লে যাব, কাউকে অভিনয় করতে দেবো না।'

এমনি করে' দুটো দিন ঝগড়াঝাঁটি করবার পর, হঠাৎ তিন দিনের দিন সুকুমারের হ'লো জ্বর।

মাষ্টারমশাই বললেন: 'তোমরা রিহার্স্যাল্ চালাও। জ্বর ভাল হোক্, সুকুমারকে আমি বুঝিয়ে বলব—সে নিজে নাট্যকার, অভিনয় নাই-বা করলে!'

রিহার্স্যাল চলতে লাগলো।

হরেনদের বাড়ী কার্ত্তিক পূজো হয়। সেইদিন রাত্রে তাদের চণ্ডীমণ্ডপের উঠোনে হবে অভিনয়। বাঁশ দিয়ে বড় বড় তক্তাপোষ দিয়ে চমৎকার ষ্টেজ্ তৈরি হয়েছে। এদিকে রিহার্স্যালও প্রায় শেষ! এমন দিনে ডাক্তার বলে' গেল—সুকুমারের হয়েছে টাইফয়েড্। জ্বরের ঘোরে সে ভুল বকছে।

ছেলেরা রোজই আসে সুকুমারকে দেখতে। সেদিনও এলো। তখনই জ্ঞান হয়, তখনই আবার অজ্ঞান হয়ে পড়ে; তখনই বেশ ভাল করে' কথা বলে, তখনই আবার ভুল বকতে থাকে।

সুকুমারের মা কেঁদে কেঁদে সারা হচ্ছে। দুখিণী মা'র ওই একটিমাত্র সন্তান। কি যে হবে কে-জানে!

কার্ত্তিক পূজোর আর মাত্র দুটি দিন বাকি।

হরেন বললে : 'অভিনয় তাহ'লে আমরা করি সুকুমার?'

সুকুমার বললে : 'কর।'

হরেন বললে . 'তুমি সেরে ওঠো, তখন তোমাকে সিরাজ সাজিয়ে আমরা আবার অভিনয় করব।'

সুকুমার বললে : 'বেশ।'

সুকুমারের মা কাঁদতে লাগলো।

ছেলেরা চলে যেতেই সুকুমার হঠাৎ চীৎকার করে' উঠলো : 'হরেনকে আমি মারবো। মেরে খুন করে' ফেলবো।'

মা তাড়াতাড়ি মাথায় জলপটি দিলে। বললে : 'চুপ কর বাবা! ও কী যা-তা' বলছিস?'

বলতে বলতে মা'র দু'চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে এলো।

সুকুমার জ্বরের ঘোরে বলতে লাগলো : 'হরেনের সব মিছে কথা। সিরাজের পার্ট ও আমাকে দেবে না—আমি জানি।'

তারপর কি যে সে বলতে লাগলো, মা তার একবর্ণও বুঝতে পারলেন না।

সুকুমার তখন সিরাজের পার্ট মুখস্থ বলছে ঃ 'মীরজাফর, তোমার প্রাণাধিক পুত্র মীরণের মাথায় হাত রেখে তুমি শপথ করেছিলে, তোমাকে বিশ্বাস করে' তোমার পায়ের কাছে আমি আমার রাজমুকুট নামিয়ে দিয়েছিলাম, মুসলমান হয়ে তুমি তোমার শপথ রক্ষা করলে না, রাজার মুকুট দু'পায়ে দলে' দিয়ে বাংলা বিহার উড়িষ্যার স্বাধীনতা, সারা হিন্দুস্থানের স্বাধীনতা—'

এই পর্য্যন্ত বলেই সে থেমে গেল।

মা ডাকলে : 'সুকুমার!'

সুকুমার চোখ চেয়ে একবার তাকালে। বললে : 'মা!'

মা'র দু'চোখ বেয়ে তখন দর্ দর্ করে' জল গড়াচ্ছে। পল্লীগ্রামের অশিক্ষিতা মেয়ে তার মা, কে যে মীরজাফর, আর কে যে মীরণ, কোথায় হিন্দুস্থান, আর কোথায় তার স্বাধীনতা কে তা রক্ষা করলে-না-করলে কিছুই সে জানে না, কিছুই সে জানতে চায় না, শুধু জানতে চায়—তার এই একমাত্র পুত্রের জীবনরক্ষার ভার, হে ভগবান, তুমি গ্রহণ করেছ কি-না?

অভিনয়ের দিন সকালে সুকুমারের অবস্থা বেশ ভালই

মনে হ'লো। মাকে জিজ্ঞাসা করলে: 'তুমি দেখতে যাবে না মা?'

মা বললে: 'না বাবা, তোমাকে ছেড়ে আমি যাব কেমন করে'?'

ডাক্তার বলে' গেলেন: 'সুকুমার এযাত্রা রক্ষা পেয়ে গেল। আর কোনও ভয় নেই।'

মা'র প্রার্থনা বুঝি ভগবান স্বকর্ণে শুনেছেন! সজলচক্ষে মা তার হাতদুটি জোড় করে' ভগবানের উদ্দেশে একটি প্রণাম করলে।

সন্ধ্যায় হরেনদের চণ্ডীমণ্ডপে অভিনয় আরম্ভ হ'লো। শহর থেকে সিন্ এসেছে, সাজ-পোষাক এসেছে, বড় বড় কেরোসিনের পাম্প-করা আলো এসেছে।

সামিয়ানা খাটানো উঠানে প্রকাণ্ড আসর গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতায় একেবারে সরগরম হয়ে উঠেছে।

সবই এসেছে, সকলেই এসেছে, আসেনি শুধু আমাদের আঠারোবছরের সেই ছেলেটি—যাকে কেন্দ্র করে' আজ এই অভিনয়ের আসর রচিত হয়েছে। আসেনি শুধু এই নাটকের স্রষ্টা, নাট্যকার সুকুমার।

আলোকোজ্জ্বল এই অভিনয়-আসরের অনতিদূরে, ঝিল্লি-মুখরিত অন্ধকার পল্লীর এক নিভৃত পথপ্রান্তে সে তখন

রোগশয্যায় শুয়ে আপন মনেই বিড়্‌বিড়্‌ করে' কি যেন বলছে। শিয়রের কাছে একটি প্রদীপ জ্বলছে, আর তারই নীচে মাটিতে আঁচল পেতে শুয়ে তার মা। ডাক্তার বলে গেছে, সুকুমার ভাল আছে, তাই এতদিনের রাত্রি জাগরণের পর মা বোধকরি নিশ্চিন্তে একটুখানি ঘুমিয়ে পড়েছে।

ওদিকে নাটক তখন খুব জমে উঠেছে। মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় পলাসীর যুদ্ধে সিরাজের বীর সেনাপতি মীরমদন মারা গেছে। সিরাজকে সর্ব্বপ্রকারে সান্ত্বনা দিয়ে বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর গোপনে ক্লাইভের কাছে চিঠি লিখে পাঠিয়েছে, রাত্রি তিনটার সময় অতর্কিতে সিরাজের শিবির আক্রমণ করবার জন্যে। ষ্টেজের ওপর মীরজাফর একাকী সদম্ভে পদচারণা করতে করতে বক্তৃতা করছে। সমস্ত দর্শকের মন তখন তার ওপর বিতৃষ্ণায় ভরে গেছে। হরেনের বক্তৃতা শোনবার জন্যে গ্রীণরূম্ ছেড়ে অভিনেতারা এসে দাঁড়িয়েছে উইংসের পাশে।

হঠাৎ দেখা গেল, গায়ে শুধু একটা কাপড় জড়িয়ে, মাথায় মুকুট পরে' ছদ্মবেশী সিরাজ ছুটে এসে দু'হাত দিয়ে তার গলাটা চেপে ধরলে। এত জোরে সিরাজ তার গলাটা চেপেছে যে, মীরজাফর আর কিছুতেই সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারলে না। না পারলে তার হাত দুটো ছাড়াতে না পারলে

চীৎকার করতে, ছু'জনেই পড়লো গিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে ষ্টেজের একপাশে! বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরের ওপর দর্শকের

ছদ্মবেশী সিরাজ ছুটে এসে ছু'হাত দিয়ে তার গলাটা চেপে ধরল।

মন তখন বিরূপ। চারিদিক থেকে ক্রমাগত হাততালি পড়তে লাগলো। কিন্তু না, সিরাজ ত' এমন করে' অতর্কিতে

মীরজাফরকে হত্যা করেনি! নাটকে ত' এই সময় ড্রপ্ পড়বার কথা! দর্শকের জয়োল্লাস আর ঘন ঘন করতালির ওপরেই ড্রপ ফেলে দেওয়া হ'লো।

ছেলেরা তাড়াতাড়ি ছুটে এলো ষ্টেজের ওপর। সর্ব্বনাশ! এ ত' সিরাজদ্দৌলা নয়, এ যে সুকুমার! মাথার মুকুট তখন তার ধূলোর ওপর গড়িয়ে পড়েছে। মীরজাফর-বেশী হরেন তার হাত দুটো গলা থেকে ছাড়াতে গিয়ে তার মুখের পানে তাকিয়ে চীৎকার করে' উঠলো।

ওদিকে ঠিক সেই সময়ে কান্নার শব্দে সবাই দেখলে—সুকুমারের মা কাঁদতে কাঁদতে ছুটে আসছে: 'সুকুমার! সুকুমার!'

সুকুমার বিকারের ঘোরে ছুটে এসেছে এইখানে। মা একটুখানি ঘুমিয়ে পড়েছিল ক্লান্ত হ'য়ে।

কিন্তু মা'র কান্না কে থামাবে?

দর্শকের আনন্দোল্লাস আর হাততালি তখনও থামেনি। তারই মাঝখানে ড্রপ্ উঠলো। হরেন উঠে দাঁড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললে: 'মীরজাফর মরেনি, মরেছে সিরাজ! আপনারা দেখে যান্!'

সবাই ছুটে গেল দেখবার জন্যে। সবাই দেখলে—উইংসের একপাশে পড়ে আছে হিমশীতল সুকুমারের মৃতদেহ।

বাল্যাবধি যে-সিরাজের শোচনীয় পরিণাম-কাহিনী তাব অন্তরাত্মাকে আচ্ছন্ন করে' ছিল, অষ্টাদশ বর্ষীয় বালক স্থকুমার তার জীবন দিয়ে সহস্র নর-নারীর অশ্রু-অর্ঘ্যে তাবই পুণ্য-স্মৃতির শেষ তর্পণ করে' গেল।
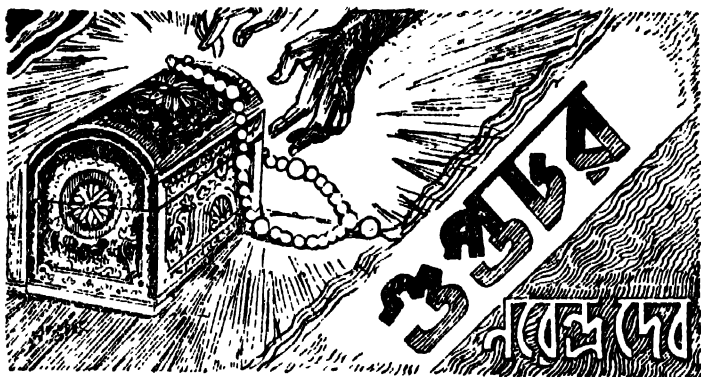
বিজয়পুরের রাজকন্যা মণিমালিকার সঙ্গে জহরগড়ের মহারাজকুমার মাণিক্যমুকুটের বিবাহ। সমস্ত বিজয়পুর রাজ্য ও রাজপ্রাসাদে বিবাহ উৎসবের ধূম লেগেছে। সারা শহরে মহা সমারোহ। রাজপথ পত্র, পুষ্প, পতাকা ও দীপমালায় সুসজ্জিত। রাস্তার মোড়ে মোড়ে তোরণদ্বার নির্ম্মিত হয়েছে। প্রত্যেক তোরণদ্বারের উপর নহবৎখানা বসেছে। প্রহরে প্রহরে সেখানে নহবৎ বাজ'ছে। রাজপুরীতে শানাই, শঙ্খ, হলুধ্বনি ও গীতবাদ্যের বিরাম নেই!

আমোদ প্রমোদের বন্যা এসে লেগেছে যেন সমগ্র বিজয়পুর রাজ্যে !

জয়গড়ের মহারাজা ও মহারাণী বিবাহের কিছুদিন আগেই বিজয়পুরের মহারাজার বিশেষ অনুরোধে মহারাজ কুমার মাণিক্যমুকুটকে নিয়ে বিজয়পুরের গজমতি-প্রাসাদে মুক্তা-মহলে এসে অতিথি হয়েছেন। সঙ্গে তাঁর মন্ত্রী, সেনাপতি, পাত্র, মিত্র, সৈন্য, সামন্ত, সভাসদ ও বরযাত্রীরা সব এসেছেন। সংখ্যায় তাঁরা হবেন প্রায় পাঁচ হাজার। তাঁদের জন্য এসেছে হাতী, ঘোড়া, উট, রথ, পাল্কী, তাঞ্জাম—যত রকমের যান বাহন। আর এসেছে চাকর, দাসী, প্রহরী, লোকজন, ব্রাহ্মণ, পুরোহিত, নাপিত। হুলুস্থুল পড়ে গেছে ছোট্ট বিজয়পুর রাজ্যে। চলেছে দিবারাত্র হৈ হৈ-রৈ রৈ কাণ্ড !

বিজয়পুর রাজ্যের রাণী নেই। মাতৃহীনা রাজকুমারী মণিমালিকাই ছিলেন রাজ-অন্তঃপুরের একমাত্র কর্ত্রী। কিন্তু তিনি নিজে আজ বিয়ের কনে। কে সব দেখে-শোনে ক'রে? রাজা তাই আনিয়েছেন মণিমালিকার মামা ও মামীকে, মাসী ও মেসোকে। কিন্তু, বেধে গেছে এদের তু'পক্ষের মধ্যে মহা গণ্ডোগোল ! মামীর ইচ্ছা মণিমালিকার বিবাহে তিনিই কর্ত্রী হবেন,—ওদিকে মাসীর ইচ্ছা মণি-মালিকার বিবাহে তিনিই কর্ত্রী হবেন।

মামীরাণী হুকুম দিয়েছিলেন রাজকুমারীর বিবাহে রাজপ্রাসাদের প্রত্যেক ভৃত্য মূল্যবান রঙীন বসন 'ও উত্তরীয়, এবং প্রত্যেক দাসী শাড়ী ও ওড়না পাবে। মাসীরাণী এসে হুকুম দিলেন, দশ বছরের পুরাতন রাজকর্ম্মচারী যারা; তাঁরা পাবেন পট্টবস্ত্র, উত্তরীয় ছাড়া কণকবলয়, স্বর্ণঅঙ্গদ, মুক্তাকেয়ুর ও কণ্ঠহার!

পুরবাসীরা উল্লাসে মাসীরাণীর জয়ধ্বনি করে উঠলো। মামীরাণীর মুখ বিদ্বেষে বিবর্ণ হ'য়ে গেল। তিনি মামা-মহারাজকে গিয়ে ব'ললেন—'আমি আজই এখান থেকে চলে যাবো, যদি তুমি এর একটা বিহিত না করো। তারপর মামা মহারাজ আর মামীরাণীতে অনেকক্ষণ চুপি চুপি কি কি আলোচনা ও পরামর্শ হ'ল। মামীরাণী হাসিমুখে আবার অন্তঃপুরের কাজে মন দিলেন।

জহরগড় রাজ্য হীরা জহরতের জন্য বিখ্যাত। জহর-গড়ের রাজ পরিবারে একটি দুর্লভ মণিমাণিক্যের অমূল্য কণ্ঠ-হার আছে, দেশ বিদেশের বড় বড় জহুরীরা বলেন, সে হারের দাম দশ কোটী স্বর্ণমুদ্রারও বেশী! রাজবংশের নিয়ম অনুসারে যিনি যখন মহারাণী হ'ন তিনিই একমাত্র এই কণ্ঠহার পরতে পারেন কেবল এক রাত্রির জন্য,—কেবল পুত্রের বিবাহ-উৎসব অনুষ্ঠানে। অন্য কোনো সময়ে নয়। কাজেই জনসাধারণের

এ অমূল্য কণ্ঠহার দেখবার সৌভাগ্য সহজে ঘটেনা। রাজ-ভাণ্ডারে সতর্ক প্রহরীবেষ্টিত কোষাগারে সুদৃঢ় লৌহ পেটিকার মধ্যে এ হার সযত্নে রক্ষিত থাকে।

জহরগড়ের রাণী কাল সেই অমূল্য মণিহার কণ্ঠে পরে বিবাহ সভায় উপস্থিত হবেন। দিকে দিকে এ সংবাদ বিদ্যুৎ-বেগে রটে গেছে! চারিদিক থেকে কৌতূহল উৎসুক ব্যগ্র নরনারী সে মালা দেখবার লোভে বিবাহ সভার আশে পাশে আগে হ'তেই স্থান অধিকারের জন্য ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছে। কোনো সাধারণ চোরে কখনো এ হার চুরি করবার কল্পনাও করতে পারে না, কিন্তু এমন সব দুঃসাহসী দুর্দ্দান্ত দস্যুও অনেক দেশে আছে, যারা একাধিকবার এই দুর্লভ মণিহার অপহরণের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু মহারাজার নিযুক্ত একজন সুদক্ষ-গুপ্তচর এমনিই সজাগ পাহারা রেখেছে এর উপর, যে বার বার তাদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে! সে গুপ্তচরটি এখানেও সঙ্গে এসেছে, তবু জহরগড়ের মহারাজা বিজয়পুরের অধীশ্বরকে পূর্ব্বাহ্নেই বলে রেখেছেন—মহারাণীর মহামূল্য মণিহারের সমস্ত দায়িত্ব আপনার। আপনার রাজ্যের সীমানার মধ্যে যদি এ-কণ্ঠহার চুরি যায়, তাহ'লে আপনার এই বিজয়পুর রাজ্যটি আমাকে ছেড়ে দিয়ে এর ক্ষতিপূরণ করতে হবে। কারণ এ অমূল্য রত্নমালার পরিবর্ত্তে একমাত্র

আপনার রাজ্য বিনিময়ই উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ, আর কোনো কিছুর পরিবর্ত্তেই এ মালার মর্য্যাদা রক্ষা হয়না।.

বিজয়পুরের অধীশ্বর দম্ভভরে এ দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে তুলে নিয়েছেন। বলেছেনঃ মহারাজ, ভয় পাবেন না, নিশ্চিন্ত থাকুন। বিজয়পুরের হীরাজহরৎও নিতান্ত অল্প নয়। আমার বংশের গজমতি হার স্বয়ং দেবী বীণাপাণী আপন কণ্ঠ হ'তে খুলে আমার বংশের এক পূর্ব্বপুরুষের বিদ্যারাধনায় পরিতুষ্ট হয়ে তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন। একমাত্র রাজ কুমারের বিদ্যারম্ভের দিন সেই দেবদত্ত গজমতিহার বিজয়পুর রাজ্যের রাজকুলবধূ পরিধান করতে পারেন। আর কোনদিন কেউ তা' পরতে পারেন না! যুগ যুগ ধরে এই দুর্লভ দৈবী-সম্পদটি বিজয়পুরের বিশ্বস্ত বীর কর্ম্মচারীরা রক্ষা করে আসছে; সুতরাং, মাভৈঃ! আপনার মহামূল্য মণিহার আমাদের পক্ষের কোনো অসর্তকতায় কখনো খোয়া যাবেনা নিশ্চয় জানবেন। তবে যদি আপনাদের অসাবধানতায় এ ক্ষতি হয় তাহ'লে আমরা দায়ী হব না কিন্তু!

দর্পিত অহঙ্কারে বিজয়পুরের মানসম্ভ্রম রক্ষার জন্য এমনিতর কথা তিনি বলে এসেছিলেন বটে, কিন্তু আতঙ্ক ও উদ্বেগের তাঁর আর অন্ত ছিল না। যদি যথার্থই চুরি যায়—তবে? এই

সময় মামা মহারাজ এসে চুপি চুপি তাঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললেন, 'রাজাবাহাদুর! একটা ঘটনা হঠাৎ কানে আসায় আমি ছুটে আপনাকে জানাতে না-এসে কিন্তু পারলাম না!'

বিজয়পুরের রাজা ব্যস্ত হয়ে জানতে চাইলেন—ঘটনাটা কি? মামা মহারাজ ধীরে ধীরে অত্যন্ত কুণ্ঠিত সবিনয়ে বললেন,—'দেখুন বলতে কিন্তু আমার ভারি লজ্জা করছে; আপনি হয়ত' কী মনে করবেন! আপনাব ঐ যে ভায়রা-ভাইটিকে আমদানী করেছেন, ঐ যিনি রাজকুমারী মণিমালিকার মেসো মহারাজ—ওই ভদ্র লোকটিকে একটু চোখে চোখে রাখবেন।'

বিজয়পুরের মহারাজ বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন—'কেন বলুন ত?'

মামা মহারাজ একটু কেসে, গলাটা ঝেড়ে, একবার ঢোক গিলে বললেন—'কাল সন্ধ্যের সময় যখন রাজউদ্যানে একটু বেড়িয়ে বাড়ী ফিরছি, সেই সময় জম্বুকুঞ্জের ঝোপের মধ্যে জনকতক লোক ফিস্ ফিস্ করে কি পরামর্শ করছে কানে গেল। আমি একটু আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে কান পেতে তাদের কথাগুলো শোনবার চেষ্টা করলুম। সব কথা যদিও ঠিক শুনতে পেলুম না, কিন্তু যেটুকু কানে এলো তাতে বেশ

স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, কারা যেন ঐ ঝোপের মধ্যে গোপনে পরামর্শ ক'রছে—কালই ওরা সুযোগ বুঝে জহরগড়ের রাণীর গলার সেই অমূল্য মাণিক্যহার চুরি করবে!'

বিজয়পুরের মহারাজ একথা শুনে চমকে উঠলেন! বললেন 'কে তারা? আপনি কি তাদের মধ্যে কাউকে চেনেন?'

মামা মহারাজ নিতান্ত ভাল মানুষের মতো বললেন—'কাউকেই চিনিনি, রাজাবাহাদুর! তবে দলটি যখন ঝোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে বাইরে চলে গেল, তাদের মধ্যে একজন শুধু প্রাসাদের দিকে ফিরলো। উৎসবের উজ্জ্বল আলোয় তার মুখ দেখতে পেয়ে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলুম! তিনি আর কেউ নন, আপনারই ওই ভায়রা-ভাই—রাজকুমারীর মেসোমহারাজ! স্ফটিক দীপাধারের আলোকে আমি তাঁকে বেশ সুস্পষ্ট চিনতে পেরেছি!'

বিজয়পুরের মহারাজ ক্ষণকাল কি চিন্তা ক'রে আবার প্রশ্ন করলেন—'তা' এরকম একটা প্রয়োজনীয় ঘটনা আপনি কালই আমাকে জানাননি কেন? পুরো একটা রাত আর একটা দিন কেটে যাবার পর তবে আপনি আমাকে এই বিপদের সম্ভাবনা জানাতে এলেন?'

মামামহারাজ আমতা আমতা ক'রে বললেন—'কী

জানেন রাজাবাহাত্বর—অমন একজন মাননীয় মানুষের মধ্যে যে এতখানি বিশ্বাসঘাতকতা থাকতে পারে এ আমি আশা করিনি! তাই চট্ করে আপনার কাছে কেন, কারুর কাছেই এ-কথা বলতে সাহস করিনি। কিন্তু মনটা আমার অস্থির হয়ে ছট্‌ফট্ করেছে আপনাকে বলবার জন্য। আজ মণিমালিকার মামীরাণীকে ডেকে চুপি চুপি ব্যাপারটা সব বললুম। তিনি শুনেই আমাকে রাজাবাহাত্বরের কাছে পাঠিয়ে দিলেন সব বলতে এবং তাঁর নাম করে অনুরোধ করতে যে—মেসোমহারাজ আর মাসীরাণীকে এখনি যেন রাজ্যের বাইরে চলে যাবার আদেশ দেওয়া হয়।"

বিজয়পুরের মহারাজ কথাটা শুনে বেশ একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন। বললেন, "আচ্ছা, মন্ত্রীদের সঙ্গে এ বিষয়ে কি করা কর্ত্তব্য মন্ত্রণা করে পরে আদেশ দেবো।"

মামামহারাজ একটু যেন হতাশ হ'য়ে ফিরে গেলেন।

মন্ত্রীরা বিজয়পুরের মহারাজকে পরামর্শ দিলেন যে রাজকুমারীর বিবাহ উপলক্ষে আনন্দ-উৎসবে যোগদানের জন্য যাঁদের নিমন্ত্রণ ক'রে আনা হয়েছে, বিনা প্রমাণে তাঁদের উপর এরূপ অপমানজনক দণ্ডাদেশ দেওয়া ঠিক হবে না।

তাতে উৎসব-আনন্দ অনেকখানি ম্লান হয়ে যাবে। বরং আর এক কাজ করা যাক, বিজয়পুর রাজ্যের যিনি শ্রেষ্ঠ গুপ্তচর তাঁকে ডেকে পাঠিয়ে বলে দেওয়া হোক—মেসো-মহারাজের উপর খুব সতর্ক ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে। তাঁর গতিবিধির উপর সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখলে তিনি যথাসময়ে ঠিক ধরা পড়বেন। মামামহারাজার মতলব সম্বন্ধেও আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ হচ্ছে—সুতরাং ওঁর উপরও একটু সতর্ক দৃষ্টি রাখা দরকার।

মন্ত্রীদের এ পরামর্শ সমীচীন মনে করে বিজয়পুরের মহারাজ সেইরূপই আদেশ দিলেন।

বিজয়পুরের প্রধান গুপ্তচরকে রাজাবাহাদুর নিজে সঙ্গে এনে মেসোমহারাজের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন—"দেখুন ইনি আমার একজন বিশেষ বন্ধু, মণিমালিকার বিবাহে যোগ দিতে বহুদূর থেকে এসেছেন। আপনি একটু বিশেষ ভাবে এঁর সেবা যত্ন ও পরিচর্য্যার প্রতি লক্ষ্য রাখবেন, যেন এঁর কোনো রকম কষ্ট বা অসুবিধা না হয়।" গুপ্তচরকে উদ্দেশ করে বললেন—"বন্ধুবর, আপনি সর্ব্বদা এঁকে আপনার কাছে পাবেন, ইনি এ বিবাহে একজন প্রবীণ কর্ম্মকর্ত্তা, যখন যা প্রয়োজন হবে এঁকে বলবেন। এঁর উপরই দিয়ে গেলেম আপনার সমস্ত ভার।"

রাজাবাহাদুর ব্যস্ত হয়ে চলে যাচ্ছিলেন, কিন্তু, মেসোমহারাজ তাঁকে ডেকে বললেন, "ওহে রাজাবাহাদুর শুনেছ? জহরগড়ের জনকতক লোক কাল সন্ধ্যায় বাগানে বেড়াতে এসে আমায় বলছিল যে, মহারাণীর মূল্যবান মণিহারটা যাতে না চুরি যায় সে সম্বন্ধে আমাদের দিক থেকেও কিছু পাহারার ব্যবস্থা করতে।" "আচ্ছা সে হবে এখন!" বলে রাজাবাহাদুর চলে গেলেন।

রাজাবাহাদুরের এই বন্ধুটির সঙ্গে আলাপ পরিচয় ক'রে মেসোমহারাজ খুব খুশি হ'লেন। লোকটি যেমনি রসিক তেমনি আমুদে। মেসোমহারাজ তাঁর সঙ্গে একেবারে গলায়-গলায় মিসে গেলেন। সুযোগ বুঝে 'গুপ্তচর' এক-সময়ে তাঁকে জহরগড়ের মহারাণীর মণিহারের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। মেসোমহারাজ বললেন—"কে জানে মশাই! শুনছিং ত' সে এক অদ্বিতীয় সামগ্রী! দশ কোটী, বিশ কোটী স্বর্ণমুদ্রা দাম সে হারের, দেখতে নাকি ভারি সুন্দর, মাণিক-গুলো রাত্রে জ্বলে, তা থেকে নীল আলো ঠিক্‌রে বেরোয়!"

গুপ্তচর জিজ্ঞাসা করলেন—"আপনি কি সে মালা দেখেছেন?"

মেসোমহারাজ বললেন—"না মশাই, কি করে দেখবো বলুন? শুনছি সে হার নাকি অসূর্য্যম্পশ্যা! মাত্র রাজপুত্রের

বিবাহরাত্রে মহারাণী একবার তা কণ্ঠে ধারণ করবার সুযোগ পান!”

“তবে ত’ কালই আমরা সে হার দেখতে পাবো! কালই ত’ এখানে জহুরগড়ের রাজপুত্রের বিবাহ! মহারাণী সেই হার গলায় দিয়ে কাল বিবাহসভায় আসবেন, শুনে এলুম যে পথে।” এই বলে গুপ্তচর মেসোমহারাজের মুখের দিকে খুব তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কী যেন লক্ষ্য করতে লাগলেন।

মেসোমহারাজ বললেন—“আপনার যদি এ বয়সেও অত সখ থাকে, আপনি যাবেন তা’হলে দেখতে; আমি মশাই ও ভীড়ের মধ্যে একজন স্ত্রীলোকের গহণা দেখবার জন্য কষ্টভোগ করতে ঢুকবোনা, একটু ফাঁকায় থাকবো তা আগেই আপনাকে বলে রাখছি।”

মেসোমহারাজের এ কথা শুনে গুপ্তচর মনে মনে এক-রকম স্থির করেই নিলেন যে, তা’হলে আজ রাত্রেই এরা মহারাণীর হারটা নিশ্চয়ই সরিয়ে ফেলবার ব্যবস্থা করেছে। কাল বিবাহসভায় এ দুঃসংবাদ দেখছি হুলস্থূল বাধাবে!

বিজয়পুরের মহারাজের গুপ্তচর অগত্যা সেইদিনই সন্ধ্যার অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে গজমতিপ্রাসাদের দিকে রওনা হ’লেন। একেবারে বামাল সমেত চোরকে হাতেনাতে ধ’রে দিয়ে বাহাদুরী দেখাবার একটা প্রবল ঝোঁক হয়েছিল তার।

রাজারাণীর খাস ভৃত্য ও চাকর দাসীদের কাছে পুঙ্খানু-পুঙ্খ অনুসন্ধান ও খোঁজখবর ক'রে ছদ্মবেশী গুপ্তচর অচিরেই আবিষ্কার করে ফেললেন যে, মুক্তামহলের কোন্ ঘরে কোথায় কোন্ লোহার সিন্দুকের মধ্যে কি ভাবে সেই অমূল্য মণিহার অবস্থান করছে।

কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরে সুযোগ ও সুবিধা বুঝে চট্ করে তিনি একসময় একেবারে সেই মহলের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। নির্দ্দিষ্ট ঘরের দরজায় অবশ্য দুর্ভেদ্য তালা বন্ধ ছিল। কিন্তু গুপ্তচর বুদ্ধি করে ছাদের আলসে থেকে ঝুলে প'ড়ে জানালা গ'লে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছিলেন।

সিন্দুকটিও খুঁজে বার করতে তাঁর বিলম্ব হ'ল না। কৌতূহল বশে সিন্দুকটির ডালা টেনে দেখতে গিয়ে গুপ্তচর অবাক হ'য়ে গেলেন! সিন্দুকটি খোলাই রয়েছে। একটু নড়ে-চেড়ে হাতড়ে দেখতেই বেরিয়ে পড়লো সেই মহামূল্য মণিমালা!

হ্যাঁ, মহামূল্য রত্নহারই বটে! যথার্থই অদ্বিতীয়! সেই অন্ধকার রুদ্ধঘরের মধ্যেও কালো মেঘের বুকে বিদ্যুৎ চমকের মতো সে মণিমালার নাড়া-চাড়া পেয়ে ক্ষণে ক্ষণে জেল্লা ঝকমকিয়ে উঠতে লাগলো! বিজয়পুর রাজ্যের প্রধান গুপ্তচর বিস্ময়ে নির্ব্বাক হ'য়ে যখন সেই আশ্চর্য্য রত্নহারের সৌন্দর্য্য

একমনে নিরীক্ষণ ক'রছিলেন, হঠাৎ পিছন থেকে বাঘের মতো লাফ দিয়ে এসে কে যেন তাঁর ঘাড়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো !

রত্নহার হাত থেকে ছিট্‌কে কোথায় চলে গেল। চললো তখন সেই আততায়ীর সঙ্গে গুপ্তচরের প্রাণপণ ধ্বস্তাধ্বস্তি নিঃশব্দে তু'জনে পরস্পরের শক্তিপরীক্ষা ক'রতে সুরু করলে কখনো এ ওকে নীচে ফেলে বুকের উপর হাঁটু দিয়ে চেপে ধরবার উপক্রম করে, আবার তৎক্ষণাৎ ও একে টেনে নীচে নামিয়ে উপরে চড়ে বসে ! এ ওর গলা টিপে ধরবার চেষ্টা করে, ও এর হাতত্নটো বেঁধে ফেলবার জন্য উদ্যত হয়।

এমনি ক'রে আধঘণ্টা মরিয়ার মত দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলবার পর বিজয়পুর রাজ্যের গুপ্তচর অতিকষ্টে আততায়ীকে পরাস্ত ক'রে তার ত্নই হাত এক কঠিন লৌহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ ক'রে ফেললে তারপর চক্‌মকীর সাহায্যে দীপশলাকা জ্বেলে তার মুখের দিকে চেয়ে দেখলেন সে সম্পূর্ণ অপরিচিত একজন লোক গুপ্তচর আশা করেছিলেন নিশ্চয় আলো জেলে দেখতে পাবেন তাঁর পরিচিত সেই মেসোমহারাজকে ! কিন্তু মেসোমহারাজের পরিবর্ত্তে এক অচেনা মুখ দেখে বিস্মিত হয়ে গম্ভীর ভাবে প্রশ্ন করলেন—

"তুমি কে ?"

আততায়ীর সঙ্গে গুপ্তচরের প্রাণপণ ধ্বস্তাধ্বস্তি চললো

শৃঙ্খলাবদ্ধ আততায়ী তার উত্তর না দিয়ে প্রতিপ্রশ্ন করলে—"তুমি কে ?"

গুপ্তচর বললে—"আমি যে হইনা, আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও, তুমি কি মেসোমহাজের লোক ?"

উত্তর হ'ল—"তোমার মেসো বা মাস্ততো ভাইয়ের দলের আমি কেউ নই।"

প্রশ্ন হ'ল—"এ ঘরে কেমন ক'রে ঢুকলে ? দরজা তো তালাবন্ধ, জানলাতেও আমি খিল এঁটে দিয়েছি।"

উত্তর হ'ল—"এ প্রশ্ন তো তোমাকেও করা যেতে পারে ?"

প্রশ্ন। "বেশী চালাকি করলে এখনই তোমাকে কোতওয়ালিতে ধরিয়ে দেবো জানো ?"

উত্তর। "তোমার কথা শুনে খুব হাসি পাচ্ছে! কোতওয়াল যদি আসে—ধরবে তো সে তোমাকেই!···সিন্দুক খুলে হার বার ক'রে নিয়েছিলাম—আমি না তুমি ?"

প্রশ্ন—"তুমি দেখছি তাহ'লে আমার আগেই এ ঘরে ঢুকেছিলে! সিন্দুক খোলবার পরিশ্রমটা তবে কি তুমিই করেছিলে ?"

উত্তর—"প্রয়োজন কি তার ? আমার কাছে ত' ও সিন্দুকের একপ্রস্থ নকল চাবিই রয়েছে !"

প্রশ্ন—"তুমি দেখছি তাহ'লে একটি পাকা চোর!"

উত্তর—"এটা জেনে কি আমার কাছে সাক্‌রেদী করবার ইচ্ছে হ'চ্ছে?"

প্রশ্ন—"চোরের ব্যবসা আমার নয়। কতদিন থেকে তুমি এ-কাজ করছো?"

উত্তর—"যতদিন থেকে তোমরা রাজা-রাজড়ার হীরাজহরৎ লুট করবার জন্য দল বেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছ।"

প্রশ্ন—"তুমি ভুল করছো। আমি তোমাদের দলের সহকারী বা বন্ধু নই বরং তোমাদের শত্রু! তাইতো তোমায় শৃঙ্খলাবদ্ধ করেছি!"

উত্তর—"সে ত' করবার কথা; যে হেতু তোমার এমন বিনা মূলধনের বাণিজ্যটায় বাধা দিলুম আমি! আমাকে ত' এরপর তোমার ঠিক আদর করে আলিঙ্গনাবদ্ধ করবার কথা নয়।"

প্রশ্ন—"তুমি যা ভাবছ আমি যদি তা হতুম তাহ'লে তোমার সঙ্গে এতক্ষণ আধা-আধি বখরায় হয়ত' একটা রফা ক'রে ফেলতুম!"

উত্তর—"আমিই 'রফা' করতে চাই, কিন্তু সেটা হচ্ছে তোমার 'দফা'! চোরাই মালের সম্পর্কে নয়।"

প্রশ্ন—"তোমাকে ত' বেশ রসিক চোর বলে মনে হ'চ্ছে! কিন্তু

ভয় দেখিয়ে বিশেষ সুবিধে করতে পারবে না।
কোতয়ালিতে তোমায় যেতেই হবে।"

উত্তর—"আমি ত' যেতে প্রস্তুত, কিন্তু তোমার কি সেখানে
যাবার সাহস হবে?"

প্রশ্ন—"সেটা কি পরীক্ষা ক'রে দেখতে চাও?"

উত্তর—"নিশ্চয়! তোমায় কি সহজে ছাড়বো মনে করেছো?
যখন হাতে নাতে ধরিছি, একটু নেড়ে-চেড়ে দেখবইত!"
এই কথা ব'লেই আততায়ী তার শৃঙ্খলাবদ্ধ
হাতদুটি তুলে গলায় ঝোলানো একটি বাঁশী সজোরে
বাজিয়ে দিলে।

গুপ্তচর তার এই ব্যবহার দেখে মনে করলেন যে
এ লোকটা নিশ্চয় কোনো ডাকাতের দলের সর্দ্দার। তার
দলবলকে আসবার জন্য বাঁশী বাজিয়ে ইসারা করলে! দল
যদি এসে পড়ে, গুপ্তচর একা তাদের সঙ্গে পেরে উঠবেন না
অথচ মহারাণীর মণিহার বাঁচাতে হ'লে ডাকাতদের হাত থেকে
যেমন ক'রে হোক তা রক্ষা করতেই হবে। বিজয়পুর
রাজ্যের মান ইজ্জৎ নির্ভর করছে এর উপর। তখন হঠাৎ
একটা বুদ্ধি তাঁর মাথায় এসে গেল। তিনি বিদ্যুৎবেগে
মণিহারটা কুড়িয়ে নিয়ে জানালা খুলে পালিয়ে গেলেন
এবং দ্বিতলের আলিশের উপর দিয়ে একটা পাশের ঘরের

খোলা জানালা দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়লেন। সে ঘরের দরজাও খোলা ছিল, আলো জ্বলছিল, এবং লোকজনও বসেছিল। গুপ্তচর চীৎকার ক'রে তাদের ব'ললেন "শীঘ্র আপনারা লোকজন নিয়ে পাশের ঘরে চলুন। মহারাণীর মণিহার চুরি করতে ডাকাতের দল এসেছে!"

ওদিকে বাঁশীর আওয়াজ পেয়ে জহরগড়ের মণিহার-রক্ষী বিশেষ প্রহরীরা মশাল হাতে ছুটে এসে দরজা খুলে ফেলতেই শৃঙ্খলাবদ্ধ লোকটি চীৎকার ক'রে বলে উঠ্‌লো—"মহারাণীর মণিহার চুরি গেছে! চোর প্রাসাদের মধ্যেই আছে এখনও পালাতে পারেনি, তোমরা শীঘ্র তার সন্ধান করো।"

চক্ষের নিমেষে গজমতিপ্রাসাদে একটা হুলস্থূল কাণ্ড বেঁধে গেল! মশাল হাতে মণিহার-রক্ষী প্রহরীদের ছুটোছুটি করতে দেখে জনতা তাদেরই ডাকাত মনে করে মার্ মার্ শব্দে ছুটে গেল!

ইতিমধ্যে কে যে শৃঙ্খলাবদ্ধ লোকটির একহাতের শৃঙ্খল খুলে দিয়েছিল জানা গেল না! হঠাৎ দেখা গেল সে ছুটে বেরিয়ে এসে ভীড়ের ভিতর থেকে সেই বিজয়পুরের গুপ্তচরকে চেপে ধরে বলছে—"ধরিছি! ধরিছি! বামাল সমেত চোর ধরা পড়েছে!"—

তখন, সমস্ত জনতার ভিড় এসে জড়ো হ'ল তাদের দু'জনকে ঘিরে।

তারা উভয়েই পরস্পরকে চোর প্রমাণ করবার চেষ্টা করতে লাগলো।

বিজয়পুরের গুপ্তচর ব'ললেন—"সৌভাগ্যক্রমে আমি ঠিক সময়ে গিয়ে পড়ায় মহারাণীর মণিহার রক্ষা করতে পেরেছি। ঐ লোকটি ঘরের মধ্যে লুকিয়েছিল। নকল চাবি দিয়ে সিন্দুকও খুলে ফেলেছিল ; কিন্তু, হার বার করে নেবার আগেই আমি সেখানে গিয়ে পড়াতে ব্যর্থ মনোরথ হ'য়ে আমায় আক্রমণ করে। আমি বহু কষ্টে ওকে পরাস্ত করে শৃঙ্খলাবদ্ধ করাতে ও বাঁশী বাজিয়ে ওর দলবলকে আসতে ইসারা করে। আমি তখন নিরুপায় হ'য়ে মহারাণীর হার নিয়ে পাশের ঘরে পালিয়ে আসি—"

তখনও একহাতে শৃঙ্খলাবদ্ধ সেই লোকটি ব'ললে—আমি স্বয়ং জহরগড়ের মহারাজার নিযুক্ত প্রধান গুপ্তচর ; মহারাণীর ওই মহামূল্য মণিহার অপহরণ-প্রয়াসী দস্যু তস্করের উপর সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখাই আমার একমাত্র কাজ। আজ যুবরাজের বিবাহের অধিবাসরাত্রি, প্রাসাদে ভোজ ও নৃত্যগীত হচ্ছে। সকলেই আমোদে প্রমোদে মত্ত থাকবে। সুতরাং মণিহার চুরি যাওয়ার সম্ভাবনা আজ

রাত্রেই সবচেয়ে বেশী, আমি তাই সন্ধ্যার কিছু আগে থেকেই যে ঘরে মণিহার ছিল সেখানে গোপনে অপেক্ষা করলিলাম। ঐ লোকটি ঘরের জানলা টপ্‌কে ভিতরে আসে। অন্ধকারে হাতড়ে সিন্দুক আবিষ্কার করে। কী উপায়ে যে ও সিন্দুকটি খোলে তা বুঝতে পারিনি, কিন্তু, সিন্দুকের ভিতর থেকে যখন মহারাণীর মণিহার বার করে নিয়ে ও পালাবার উপক্রম ক'রে আমি ওর ঘাড়ের উপর বাঘের মতো লাফ দিয়ে পড়ে ওকে আক্রমণ করি, কিন্তু ও কৌশলে আমাকে পরাস্ত করে শৃঙ্খলাবদ্ধ রেখে পালাতে চায় বুঝে আমি বংশীধ্বনি করে মণিহার-রক্ষী প্রহরীদের ছুটে আসতে ইঙ্গিত করি। ও তখন হাতে-নাতে ধরা পড়তে হবেই জেনে আবার জানালা গলে পালিয়েছিল। এখন ধরা পড়ে এই সব মিথ্যা গল্প বলে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে! ও লোকটা কে—এবং কেনই বা সন্ধ্যার অন্ধকারে লুকিয়ে জানালা গ'লে মণিহার-রক্ষিত কক্ষে প্রবেশ করেছিল—জিজ্ঞাসা করুন আপনারা!"

সবাই ঘাড় নেড়ে এ কথায় সায় দিয়ে বললে—"ঠিকই ত'! কে হে বাপু তুমি? মহারাণীর মণিহার রক্ষার তোমার এত চাড় কেন? নিশ্চই তুমিই চোর—"

বলার সঙ্গে সঙ্গে সবাই তাকে 'চোর! তুই চোর!' বলে

মারতে উদ্যত হ'ল। বিজয়পুর রাজ্যের গুপ্তচর যত বলে—মশাই, আমিও গুপ্তচর, বিজয়পুরের রাজাবাহাদুর আমাকে নিযুক্ত করেছিলেন মণিহার রক্ষার জন্য।"—কে তার কথা শোনে তখন! চারিদিক থেকে শব্দ উঠলো : 'মার্ মার্! বেটা চোর আবার গুপ্তচর সাজছে!'

গজমতিপ্রাসাদের মুক্তামহলে প্রচণ্ড গোলমাল ও প্রচণ্ড হৈ চৈ হচ্ছে শুনে বিজয়পুরের রাজাবাহাদুরের প্রবাল-প্রাসাদের নবরত্ন-মহল থেকে সমস্ত লোকজন ইতিমধ্যে ছুটে এসেছিল সেখানে। মামামহারাজা ও মেসোমহারাজাও এসে পড়েছিলেন। মেসোমহারাজা রাজাবাহাদুরের বিশেষ বন্ধুর এই দুর্দ্দশা দেখে বলে উঠলেন,—"ও! এই জন্যই বুঝি অনেকদূর থেকে দৌড়ে এসেছো বন্ধু, ঠিক বিয়ের রাত্রের আগের দিন? মহারাণীর মণিহার সম্বন্ধে অত খোঁজ খবর নিচ্ছিলে কি আমার কাছে এই জন্যেই?"

বাস্! আর কিছু বলতে হ'লনা! যেটুকু সন্দেহের ছায়া লোকের মনে অবশিষ্ট ছিল মেসোমহারাজের একথা শুনে তা মিলিয়ে গেল! "চোর চোর!" শব্দে সবাই চিৎকার ক'রে উঠলো! "তবে-রে—তোর গুপ্তচরের নিকুচি করেছে!" বলে আস্তেন গুটিয়ে অনেকেই এগিয়ে গিয়ে চড়টা, চাপড়টা, চাঁটিটা, ঘুসিটা, পটাপট গুপ্তচরের মাথায় মারতে সুরু করে দিলে।

হঠাৎ মামামহারাজ এগিয়ে এসে বললেন—'আহাহা করেন কি? আপনারা এ কা'কে ধ'রে ঠেঙাচ্ছেন? ও বেচারীর দোষ কি? গরীব মানুষ বখশিসের লোভে এ-কাজ করতে গেছল! আপনারা আসল লোককে ছেড়ে দিচ্ছেন যে! ওকে মণিহার চুরি করতে পাঠিয়েছে কে জিজ্ঞাসা করুন না!"

সবাই সবিস্ময়ে একবার মামামহারাজের মুখের দিকে, একবার বিজয়পুরের প্রহৃত গুপ্তচরের মুখের দিকে চাইতে লাগলো! মামামহারাজ চোখের ইসারায় মেসোমহারাজকে দেখিয়ে দিয়ে বলতে লাগলেন, "শুনলেন না? ওঁর বন্ধু!··· বহুদূর থেকে ওঁর কাছে এসেছেন···ঠিক বিয়ের রাত্রের আগের দিন! মহারাণীর মণিহারের খুঁটিয়ে খবর নিচ্ছিলেন ওঁরই কাছে!···তাহ'লে এ হারের সন্ধানটা দিয়েছেন চোরকে আমাদের ঘরের শত্রু এই বিভীষণই! অর্থাৎ··· এইবার সব বেশ স্পষ্টই বুঝতে পারছেন বোধ হয়, পালের গোদা উনিই! ওই লোকটাকে দিয়ে হার চুরি করিয়ে আনাতে উনিই পাঠিয়েছিলেন—দয়া করে! এখন ধরা পড়ে নিজে সাধু সাজছেন!"

উন্মত্ত জনতা এ-কথা শোনবামাত্র গুপ্তচরকে ছেড়ে দিয়ে "মার্ মার্!" শব্দে মারতে উদ্যত হলো রাজাবাহাদুরের

ভায়রা-ভাই মহামান্য মেসোমহারাজকে! ভাগ্যে সেই সময় স্বয়ং বিজয়পুরের রাজাবাহাদুর আর জহরগড়ের মহারাজা সাহেব ছু'জনেই সেখানে এসে পড়লেন তাই। তাঁরা সমস্ত ব্যাপারটা শুনে খুব হাসতে লাগলেন। তারপর সকলকে বুঝিয়ে দিলেন, "এটা আর কিছুই নয়—গুপ্তচর বিভ্রাট! সিন্দুকের চাবি জহরগড়ের মহারাজা নিজেই দিতে ভুলে গেছলেন,—তাই ডালা তার খোলা ছিল!"

আজ খুব সকালেই অবিনাশবাবুর ঘুম ভেঙেছে, কিন্তু ঘুম ভেঙে অবধি তিনি গুম্ হয়ে রয়েছেন, সেই সকাল থেকেই।

মাধবী এসে জিগ্যেস করলে: "মুখ ভার করে' রয়েছ যে দাদা? সকালের ডাকে কি কোনো খারাপ খবর এল? বুল্‌ঠির চিঠি পেয়েছ নাকি? মাসীমার অসুখ শুনেছিলাম—"

"না, মাসীমা নয়।" অবিনাশবাবুর দীর্ঘশ্বাস পড়ে।

"তাহলে—তাহলে কি—" একটু ইতস্ততঃ করে' মাধবী

অবশেষে সসঙ্কোচে বলেই ফ্যালে ঃ "কোনো মাসিকপত্র থেকে তোমার লেখা ফেরৎ এল নাকি ?"

"সে তো আক্‌চারই আসচে, কোন্ মাসিক থেকে আসচে না বল্ ? আসচে নাই বা কোন্‌দিন ? তার জন্যে আবার কেউ মন খারাপ করতে যায় নাকি ? নাঃ, কোনো মাসিক নয়, মাসীও না, মাসিক পত্র, মাসীর পত্র সেসব কিছু না—তার ধার-কাছ দিয়েই না। ভারী একটা খারাপ স্বপ্ন দেখেছি কাল রাত্রে।"

এই বলে' অবিনাশবাবু আরো বেশী গম্ভীর হয়ে যান্।

"কী স্বপ্ন, শুনি ?" মাধবী উৎসাহিত হয়ে ওঠে।

স্বপ্ন-ব্যাপারের নাড়ী নক্ষত্র অনেক কিছুই মাধবীর জানা। এ-বিষয়ে মাধবীর বেশ কিছু পড়া শোনাও রয়েছে। আমাদের অনেকের মতো, পি এম্ বাগচীর পাঁজির স্বপ্ন-তত্ত্বের সেই আধ পাতার মধ্যেই ওর জ্ঞান সীমাবদ্ধ নয়—ছ-পেনী দামের, স্বপ্ন-দর্শনের, বিলিতি কী একখানা বই পর্য্যন্ত সে গিলে বসে' রয়েছে। কাজেই স্বপ্নের কথায় ওর উৎসাহিত হয়ে ওঠা আশ্চর্য্য নয় !

"স্বপ্নে দেখলাম, যে, আজকের সন্ধ্যার সাহিত্য-সমিতির সভায় আমি খুব দেরিতে গিয়ে পৌঁছেচি।" অবিনাশবাবু

বলেন। সেই সঙ্গে তাঁর নিজের মুখপত্রে ব্ল্যাক্‌-আউটের ছবি প্রকাশিত হয়।

"ও, এই!" মাধবী হতাশ হয়ে যায়। "এই কেবল! আমি ভেবেচি কী না কী! হ্যাঁ, এমন যদি হোতো যে তুমি আকাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছ, কিম্বা পাতালের গর্ভেই নাম্‌ছ, নেমে যাচ্ছ তর্‌ তর্‌ করে, কিম্বা হাতীরা তোমাকে ধরে' খাচ্ছে, কিম্বা অজগর সাপে তাড়া করেছে তোমায় তাহলে—হ্যাঁ, তাহলে আমি তার একটা হদিশ্‌ দিতে পারতাম। ভালো ব্যাখ্যা করে' দিতে পারতুম তার। এমনকি কুমীরে তোমাকে গিল্‌ছে কি গণ্ডারে গুঁতিয়ে দিচ্ছে, এ জানতে পারলেও তার একটা মানে বলা যেত—কিন্তু এ কী? এর কোনো অর্থই হয় না। একেবারে একটা বাজে স্বপ্ন। এ নিয়ে মাথা ঘামাবার কী রয়েছে এমন? য়্যাতো ভাবনাই বা কেন?"

"সাহিত্য-সমিতি,—তার সভা,—তাতে দেরী করে' যাওয়া—তার ফলে যে কী সর্ব্বনাশ—কী সমূহ ক্ষতি—সেসব তুই বুঝ্‌বিনে মাধু!—" অবিনাশবাবু থেমে থেমে, চিবিয়ে চিবিয়ে বলেন; ডুক্‌রে ডুক্‌রে কান্নার মতই যেন তাঁর কথা গুলো একে একে বেরুতে থাকে। হায় হায়, আমার কপালে যে কী দুর্গতি আছে কে জানে!"

অবিনাশবাবু হায় হায় করেন। স্বপ্নতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর

জ্ঞান না থাক্‌লেও, অন্ততঃ মাধবীর মতো তেমন টন্‌টনে না থাক্‌লেও, স্বপ্নরা যে সত্য হয়, সত্য হবার জন্যেই যে ওদের দেখা দেওয়া—এ বিষয়ে তাঁর একেবারে অভিন্ন মত। মাধবীর মতই এ-সম্পর্কে তিনি একেবারে কৃতনিশ্চয়। মনের ক্ষোভ তিনি আর উহ্য রাখতে পারেন না, মুহ্যমান হয়ে নেতিয়ে পড়েন অবিনাশ। তিন চার দফা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে যায় তাঁর। পরপর বেরিয়ে যায়।

"যদি সত্যিই হয় এ স্বপ্ন ত তাতেই বা কী?"—মাধবী ওঁকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করে: "এত ভেবে কেন কাহিল হচ্ছ শুনি? সাহিত্য-সমিতির সভায় দেরি করেই যায় সবাই। কেউ আর ঘড়ি ধরে' পৌঁছয় না।"

"তাই হয়েছে বটে য্যাদ্দিন।" অবিনাশবাবু গুরুতর গুপ্ত রহস্য ব্যক্ত করেন: "কিন্তু গত সপ্তাহের বৈঠকে আমি নিজেই সে পথ রুদ্ধ করেছি। দেরি করে' সভায় যাওয়া—ভবিষ্যতে আর সেটি করা চলবে না। গত সপ্তাহের কথাই বলি। আটটায় আমাদের জম্‌বার কথা। আমি ঠিক সময়েই গিয়ে পৌঁছেচি—যাকে বলে কাঁটায় কাঁটায় আটটায়। আমাদের সভাপতি এলেন আটটা-পনেরয়, অন্য কোথায় আরেকটা সভাপতিত্ব সেরে আসতেই তাঁর দেরি হয়ে গেল।—নিবারণ বাঁড়ুয্যে আর বনবিহারী এল

সাড়ে আটটায়, তারপরে মেঘেন মিত্তির যখন পৌঁছল, তখন তো আটটা-পঞ্চাশ! লম্বা পঞ্চাশ মিনিট্ ঠায় অপেক্ষা করতে হলে কার আর মেজাজ ঠিক থাকে বলো? এতে কার না ধৈর্য্যচ্যুতি হয়? কাজেই যেদিনকার বৈঠকে আমার বক্তৃতাটা—বাঙালীর পাংচুয়ালিটির সম্বন্ধে, সম্মুখীন সমস্ত জাজ্জ্বল্যমান্ উদাহরণ উল্লেখ করে'—বেশ একটু ঝাঁঝাঁলোই হয়েছিল, বুঝ্‌তে পারছিস্!"

"যদি হয়েই থাকে তাতে তোমার কোনো দোষ দিতে পারিনে তো দাদা!" মাধবী সায় দিয়ে বলে।

"কিন্তু তাতেই তো গোল বাধ্‌ল রে! একটা মোক্ষম্ সুযোগ পেয়ে গেল নিবারণটা! সে যে য়্যাদ্দিন এইজন্যেই ওৎ পেতেছিল তা কে জানত? অমনি সে একটা প্রস্তাব এনে ফেললে, এর পর থেকে সাহিত্য-সভায় যে-ব্যক্তি দেরি করে' পৌঁছবে সমিতির বিশিষ্ট কোনো কর্তৃপদে সে থাকলে, স্বইচ্ছায় কিম্বা অনিচ্ছাসত্ত্বেই, তক্ষুনি তাকে বরখাস্ত হতে হবে। প্রস্তাবটার মধ্যে ভয়ঙ্কর চালাকি ছিল নিবারণের—ভারী বিচ্ছিরি চালাকি। নিবারণ হচ্ছে একজন সাধারণ সদস্য, কতৃত্বপদ কিছু খোয়া যাবার তার নেই,—আদপেই নেই,—এবং সবাই জানে আমার সেক্রেটারীর পোস্ট্‌টা নেবার জন্যে অনেকদিন থেকেই সে চেষ্টায় রয়েছে। অকুলিবিকুলি করে'

মর্‌ছে বল্‌তে গেলে এই তালে সে নিজের কাজটা বাগিয়ে ফেল্‌লে,—একেবারে না বাগিয়ে ফেলুক্‌, আগিয়ে তো রাখ্‌ল, নিসন্দেহ।"

"নিবারণবাবু? যাঁর দাঁত-ভাঙা কবিতা সব?" মাধবী বলে: "সেই কবির ভেতরে এত প্যাঁচ্‌?"

"কবিতা না কচু! শব্দকল্পদ্রুম বল্‌তে পারিস্‌, কিন্তু কবিতা নয়। কিন্তু তা ভেবে আর কী লাভ? আমি ভাবছি যে আজ যদি যেতে আমার দেরি হয়ে যায় তাহলেই তো আমার হয়ে গেছে—কাল থেকে আমি তাহলে আর সেক্রেটারী নই! এমন একটা পোস্‌ট্‌ এতদিনের—এত বছরের একটা পোজিশন্‌ একদম্‌ নষ্ট!"

"তাহলে দেরি করে' যেয়ো না।" মাধবী বলে কেবল। "যাতে দেরি না হয় লক্ষ্য রেখো সেদিকে।"

"তা কি হবার যো আছেরে? স্বপ্ন দেখলাম যে! স্বপ্ন কি কখনো মিথ্যে হয়? স্পষ্টই আমার মনে পড়ছে, যে আজ দেরি করে' সভায় গিয়ে পৌঁছেচি! এখনো সেই স্বপ্নটা—বিচ্ছিরি সেই স্বপ্নটা আমার চোখের ওপর ভাসছে যেন!" অবিনাশবাবু ভারী মুষ্‌ড়ে পড়েন আবার।

"ঠিক সময়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ো"—মাধবী পরামর্শ ছ্যায়: "হাতে অনেকখানি সময় রেখে। তাহলেই হবে।"

"তাই তো করেছিলাম রে! অনেক আগে থাকতেই
বেরিয়েছিলাম বাড়ী থেকে—" অবিনাশবাবু ম্লান মুখে ঘাড়
নাড়েন: "কিন্তু কিছুতেই কিছু হোলো না। তবু লেট্ হয়ে
গেলাম। সাড়ে সাতটার সময় বেরুলাম এখান থেকে।
তারপর কথাই বল্‌ছি। গোলদিঘীর কাছে পৌঁছতেই লাগল
পনের মিনিট। কোণের সুইমিং ক্লাবের বড়ো ঘড়িটায়
স্পষ্টই দেখেছি, এখনো আমার মনে পড়ছে, তখন বেজেছিল
সাতটা পঁয়তাল্লিশ। তখনো পনের মিনিট বাকী মিটিংয়ের।
ভাবলাম প্যারাডাইজে এক গেলাস ঘোল খেয়ে যাই—ঘোল
খেয়ে বেরিয়ে দেখি গোল বাধিয়েছি। না; সময় ছিল
ঠিকই, আটটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকী, বাকী তখনো,
এখান থেকে য়্যাল্‌বার্ট্ হলের বৈঠকে পৌঁছতে পাঁচ মিনিট্ই
যথেষ্ট, কিন্তু চেয়ে দেখি, একি, আমার পরণে সুইমিং কষ্টিউম্
। সুইমিং কষ্টিউম্ পরে সাহিত্যসভার আসরে কেউ যায়না
—অন্ততঃ তার সেক্রেটারীরা তো নয়। ঐ রকম অপরূপ বেশে
গেলে, বেতনওলা চাক্‌রিই চলে যায়—অবৈতনিক পদ যে যাবে
। আর বেশী কি? সুতরাং কী মুস্কিলে যে পড়ে গেলাম,
বুঝতেই পারছিস্।—"

"যাক্, ও নিয়ে আর ভেবনা।" মাধবী অবিনাশকে
অনেকভাবে ভরসা দ্যায়: "যাতে ঠিক সময়ে, সন্ধ্যে

থাকতেই এখান থেকে বেরুতে পারো সে বিষয়ে আমি লক্ষ্য রাখব. আর বেরুবার সময় তোমার কাপড়-চোপড় ঠিকভাবে পরা হয়েছে কিনা সেদিকে নজর দিতেও কার্পণ্য করব না। তাহলেই হবে তো ?"

কিন্তু, এতটা ভরসা, মাধবীর তরফ্ থেকে এতখানি আশ্বাস সত্ত্বেও, সমস্তদিন অবিনাশের ছট্‌ফট্ করেই কাট্‌ল। স্বপ্নের ব্যাপারটা তাঁকে তাড়া করে' ফিরল যেন সারাদিন।

সন্ধ্যের আগেই, মাধবী তাঁকে পেট ভরে' খাইয়ে দিল যাতে খিদের ঝোঁকে, ভুলক্রমে, দাদা, সাম্‌নে রেস্তরাঁ পেয়ে ঢুকে পড়ে, কারি-কোর্ম্মার সঙ্গে গুলিয়ে, সাহিত্যসভা পর্য্যন্ত না হজম করে' বসেন। সাহিত্যিক মানুষরা কতটা বেমালুম ভোলানাথ হতে পারে, মাধবীর তা তো অজানা নেই।

তারপর নিজে দাঁড়িয়ে থেকে, দাদার কাপড় জামা জুতো মায় লম্বমান উত্তরীয়টা পর্য্যন্ত জড়ানো সমাধা হলে, ছোট ছেলেকে যেমন করে' খুঁটিনাটি সব খতিয়ে পোষাক পরিয়ে দিতে হয়, সেই রকম সুচারু ভাবে, খুব বিচক্ষণতার সহিত মাধবী তার দায়িত্ব পালন করে।

সাতটা পনের বাজতেই অবিনাশবাবুকে বাড়ীর বার হয়ে যেতে হয়। মাধবীই তাড়িয়ে দ্যায়।

অবিনাশবাবু মনে মনে হাসেন। এত আগে থেকে

এত সকালে, মিটিংয়ে যাবার কোনো মানে হয় না। তাঁর বাড়ী থেকে য়্যাল্‌বার্ট্‌ হল্‌, খুব গজেন্দ্র-গমনে গেলেও, বিশ মিনিটের বেশি নয়, কিছুতেই না,—সেই কুড়ি মিনিটের পথ যেতে পঁয়তাল্লিশ মিনিট্‌ লাগবে এতটা বুড়িয়ে তিনি পড়েননি এখনো।

তাছাড়াও হাসবার আরো কারণ ছিল বইকি! গত রাত্রের স্বপ্নে তিনি বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলেন সাড়ে সাতটায়, বেশ তাঁর মনে আছে—আর এখানেই তো স্বপ্নকে তিনি এক হাত নিয়ে রেখেছেন—প্রথম পদক্ষেপেই মেরেছেন—ব্যর্থ করে' দিয়েছেন বল্‌তে গেলে! স্বপ্নের অব্যর্থতাকে এ ভাবে একলাফে লঙ্ঘন করে' যাওয়া বড় কম কথা নয়।

"দূর্ দূর্! এত আগে গিয়ে কী হবে? সমিতির বেয়ারাই বা কী ভাববে তাহলে? এরকম বেয়াড়া দৃশ্য ছাখে যদি? ছিঃ!—" অবিনাশবাবু আপন মনেই বলেন: "বাঙালীর পাংচুয়ালিটির মর্য্যাদা তাতে একচুল বাড়বেনা। কুড়ি মিনিট্‌ পরে যাওয়া যেমন খারাপ, কুড়ি মিনিট আগে যাওয়া তার চেয়ে কিছু কম বিচ্ছিরি নয়। তার চেয়ে, ততক্ষণ বুল্‌টিকে একটা চিঠি লিখে মাসীমার অসুখের খবরটা নিলে কেমন হয়?"

এই বলে'—নিজ মনেই বলে'—অবিনাশবাবু সাম্‌নের

আমহার্স্ট্ ষ্ট্রীট্ পোষ্ট আপিসে ঢুকে পড়লেন। সেখানে একখানা পোষ্টকার্ড কিনে, অচেনা একটা ছেলেকে পাক্ড়ে তার ভোঁতা ফাউন্টেন্ পেন্ ধার করে' প্রবাসী মাস্তুত ভাইকে একটা চিঠি লিখ্লেন ইনিয়ে বিনিয়ে। তারপর, পোষ্টকার্ডটা ডাক বাক্সে পরিত্যাগ করে' ডাকঘরের ঘড়িটা তাঁর চোখে পড়ল।

তখনই বেজেছে সাতটা পনেব। সাতটা পনের মাত্র!

পোষ্টাপিসের ঘড়ি কখনো ভুল যায় না, তবু পোষ্টেজ বিক্রেতার সঙ্গে জিজ্ঞাসাবাদে ঘড়ির সঠিকতা এবং সচলতা সম্পর্কে নিঃসন্দিহান্ হয়ে তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্লেন। মাধবীর তৎপরতার কথা ভেবেই তাঁর দীর্ঘনিশ্বাসটা পড়ল। নিশ্চয় সে বাড়ীর ঘড়িটা বুদ্ধি করে' কুড়ি মিনিট আগিয়ে রেখেছিল।

অবিনাশবাবু আবার একটু হাসলেন। একটুখানি মুচ্কি হাসি এবার। স্বপ্নকে কি ভাবে পদে পদে ব্যর্থ করছেন, বিপর্য্যস্ত করছেন, নাজেহাল্ করছেন, সেই কথা ভেবেই তাঁর হাসি পেল। এই স্বপ্নকে—এ-হেন স্বপ্নকে আবার বিশ্বাস করে মানুষ? মাধবী ফের বই কিনে স্বপ্নের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব পড়ে, পড়ে আর মাথা ঘামায়! ছ্যা! মৃদু-মন্থর গমনে গোল-দীঘীর কাছাকাছি আসতেই তাঁর সরবতের পিপাসা পেল।

সুইমিং ক্লাবের দেয়াল-ঘড়িতে তখনো সাড়ে সাতটার বেশী হয়নি। এই সুযোগে প্যারাডাইজে বসে' এক গেলাস ঘোল খেয়ে গেলে ক্ষতি কি?

প্যারাডাইজে বস্‌তেই বিপিনকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়ে গেল। দৈবাৎ! সেও এক পাশে বসে সর্‌বৎ সিপ্‌ করছিল। অনেকদিন পরে দেখা, প্রায় তিন বছর পরে, বিপিন তাঁকে সহজে ছাড়্‌তেই চায় না। তিন বছর আগে, বিপিন তার কাছ থেকে পাঁচ টাকা ধার নিয়েছিল, কিন্তু কি কারণে, কত কি কারণে, এতদিনেও টাকাটা শোধ দিতে পারেনি, অবিনাশকে খোলসা করে' সেই কথা বোঝাতেই, পনের মিনিট লেগে গেল বিপিনের।

বিপিনের কবল থেকে নিজেকে উদ্ধৃত করে', তার বাক্‌-পটুতার আক্রমণ বাঁচিয়ে, অগত্যা—তাকে আরো পাঁচ টাকা ধার দেবার প্রলোভন সম্বরণ করে', এমন কি, ওকে এইসা এক চড় কসিয়ে দেবার জন্য উন্মুখ এবং উদ্যত হাত সাম্‌লে নিয়ে, নিজেকে পঙ্কোদ্ধার করে' বাইরে বেরুতেই অবিনাশের আরো খানিকক্ষণ গেল।

প্যারাডাইজ থেকে বেরিয়ে, সাতটা সাতচল্লিশ তখন। সুইমিং ক্লাবের ঘড়ি যদি পাঁচ মিনিট পিছিয়েও থাকে—ঢিমে তেতালাই চলে—তাহলেও, এখন, সাতটা বাঁহান্নর

মিটিংএর সময় ঝাঁট দিচ্ছ যে?

খুব বেশি নয়। আর এখান থেকে, য়্যাল্‌বার্ট হলের দোতলায়, সমিতির বৈঠকে—পা চালিয়ে আর সিঁড়ি টপ্‌কে পৌঁছতে—কতক্ষণ যায়? সাত মিনিট্‌ই কি যথেষ্ট না? তবু হাতে এক মিনিট্‌ থেকে যায়। পুরো ৬০ সেকেণ্ড!

য়্যাল্‌বার্ট হলের সিঁড়ি ডিঙিয়ে উঠতে উঠতেই অবিনাশ-বাবু শুন্‌তে পান্‌ ঘড়িতে ঢং ঢং করে' আট্‌টা বাজছে! যাক্‌, ঠিক সময়েই হাজির হ'তে পেরেছেন তবে। বনমালী বেহারা ধূলোর ঝড় উড়িয়ে, প্রবল পরাক্রমে সমিতির ঘর ঝাঁটাচ্ছে তখন।

"বনমালী! তোমার একি ব্যবহার? মিটিংএর সময়ে ঝাঁট্‌ দিচ্ছ যে, সারাদিন আজ কি কর্‌ছিলে?" অবিনাশ বকে' ছ্যান্‌—সেক্রেটারী পদোচিত মর্য্যাদা বজায় রাখতে হলে বেয়ারাকে যেমন বকা উচিত তেমনি।

"সমিতির মিটিন্‌ তো কাল রাত্রে হয়ে গেছে বাবু।" বেয়ারা বলে। কেবল এই কথা বলে।

তারপর তেমনি ঘর ঝাঁটিয়ে চলে সে—ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটারী-সমেতই ঝাঁটিয়ে চলে' যায়।

মগধ-রাজ্য ছিল তখন আর্য্যাবর্ত্তের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এব মগধের রাজধানী পাটলিপুত্র ছিল ভারতের সব-চেয়ে বড় সহর। আজ আমরা যে দিল্লীর এত নাম শুনি, তখনো তার জন্মই হয় নি। দিল্লী সহরের প্রতিষ্ঠা হয়েছে মাত্র দশম শতাব্দীতে। লৌকিক প্রবাদ ও কাল্পনিক কাব্য প্রাগৈতিহাসিক যুগের ইন্দ্রপ্রস্থ এবং কুরু-পাণ্ডবের সঙ্গে দিল্লীর সম্পর্ক আবিষ্কার করতে চায় বটে, কিন্তু ইতিহাসে আমরা যে দিল্লীর

নাম শুনি, দশম শতাব্দীর শেষ-ভাগে তার জন্ম। এবং সে বিখ্যাত হয়েছে মুসলমানদেরই দ্বারা। দিল্লী জন্মাবার আগেই ভারতব্যাপী অখণ্ড হিন্দু-সাম্রাজ্য এবং স্বাধীন আর্য্য-গৌরব হয়েছিল বিলুপ্ত।

কিন্তু পাটলীপুত্রের ভিত্তি-প্রতিষ্ঠা হয় বুদ্ধদেবের সমসাময়িক অজাতশত্রুর দ্বারা, খৃষ্ট-পূর্ব্ব ছয় শতাব্দীতে, অর্থাৎ দিল্লী-প্রতিষ্ঠার দেড় হাজার বছরেরও আগে! এবং সেখানে আসল সহর বসান অজাতশত্রুর নাতি, উদয়। তারপর মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্ত যখন পাটলিপুত্রকে করেন সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তের রাজধানী, বিদেশী ঐতিহাসিকদের মতে, তখন সে ছিল সারা পৃথিবীর সব-চেয়ে বড় সহর! আজকের হিন্দুরা তাদের অতীত-গৌরব নিয়ে যে-সব গর্ব্ব করে, তার অধিকাংশেরই সঙ্গে আছে পাটলিপুত্রের সম্বন্ধ; কারণ মৌর্য্যবংশের পরে আরো বহু রাজবংশের উত্থান-পতন হয়েছে তারই সিংহাসনে। মোগল-প্রভাবের আগে পাটলিপুত্রের চেয়ে প্রধান নগর ভারতবর্ষে আর ছিল না। লোকে তার আরো দুটি নাম রেখেছিল —কুসুমপুর, পুষ্পপুর। পাটলিপুত্রের ধ্বংসাবশেষের উপরে আজ বাস করছে পাটনা সহর।

মহাপদ্ম-নন্দ ছিল এক নাপিতের ছেলে। তার ষড়যন্ত্রে মগধের ক্ষত্রিয় রাজা মারা পড়লেন। মহাপদ্ম তখন রাজদণ্ড

কেড়ে নিয়ে সিংহাসন দখল করলে। রাজা হয়ে সে এত ক্ষত্রিয় বধ করেছিল যে, লোকে তাকে দ্বিতীয় পরশুরাম ব'লে ডাকত।

খুব সম্ভব মহাপদ্মের ছেলেরই নাম ধন-নন্দ। সে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী ব'লেই সকলে তাকে ঐ নামে ডাকত। সে রাজা হ'ল বটে, কিন্তু জাতে নীচু ও পাপী বাপের ছেলে ব'লে প্রজারা তাকে দু-চোখে দেখতে পারত না।

ভারত-সীমান্তের বিশ্ববিখ্যাত তক্ষশীলা নগর থেকে এক মহাপণ্ডিত, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও তেজস্বী ব্রাহ্মণ পাটলিপুত্রে এলেন অদৃষ্ট-পরীক্ষা করবার জন্যে। তাঁর নাম বিষ্ণুগুপ্ত।

ধন-নন্দ বিষ্ণুগুপ্তকে নিজের ধনশালার অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করলেন। এবং তাঁকে এতটা স্বাধীনতা দিলেন যে, রাজার হুকুম না নিয়েই তিনি এক কোটি টাকা পর্য্যন্ত দান করতে পারতেন? সুতরাং এটাও দেখা যাচ্ছে যে, দানশীলতার দিক দিয়ে ধন-নন্দ ছিলেন কাব্যে বর্ণিত দাতা কর্ণের মতই উদার!

কিন্তু কিছুকাল পরেই তেজস্বী বিষ্ণুগুপ্তের উদ্ধত স্বভাব রাজার পক্ষে হয়ে উঠল অসহনীয়। ব্রাহ্মণের চাকরি গেল এবং সম্ভবত কর্ম্মচ্যুত করবার সময়ে রাজা তাঁকে অপমানকর কথা বলতেও ছাড়ে নি।

বিষ্ণুগুপ্ত প্রতিজ্ঞা করলেন, নন্দ-বংশ ধ্বংস ক'রে এ অপমানের প্রতিশোধ নেবেন।

সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশ নিয়ে বিষ্ণুগুপ্ত মগধ রাজ্য ছেড়ে সুদূর স্বদেশে ফিরে যাচ্ছেন, হঠাৎ পথে তাঁর চোখে পড়ল এক অদ্ভুত দৃশ্য।

এক পল্লীপ্রান্তে কয়েকটি রাখাল-ছেলে খেলা করছে। তাদের ভিতরে একটি ছেলে রাজা হয়ে মাঝখানে ব'সে করছে বিচারের অভিনয়।

বিষ্ণুগুপ্তের তীক্ষ্ণদৃষ্টি দেখলে, শিশুর মুখে কেবল প্রতিভারই প্রকাশ নেই, সত্যিকার রাজ-লক্ষণও রয়েছে।

খোঁজ নিয়ে তিনি জানলেন, শিশুর জন্ম রাজবংশেই বটে, কিন্তু চোরে তাকে মায়ের কাছ থেকে চুরি ক'রে এক শিকারীর কাছে বিক্রী করছে। শিশুর বাপ যুদ্ধে মারা পড়েছেন।

বিষ্ণুগুপ্ত টাকা দিয়ে শিশুকে কিনে নিলেন। তারপর তক্ষশীলায় ফিরে গিয়ে নিজের হাতেই কেবল তার খাওয়া-পরার নয়, শিক্ষা-দীক্ষারও ভার গ্রহণ করলেন। বোধ হয় এর মধ্যে তাঁর বিশেষ অভিপ্রায় ছিল। বোধ হয় তিনি স্থির করেছিলেন, এই ক্ষত্রিয় শিশু হবে যখন সাবালক, তখন তাকেই তিনি ব্যবহার করবেন তাঁর পরম শত্রু ধন-নন্দের বিরুদ্ধে অস্ত্রের মত।

বিষ্ণুগুপ্তের ঘরে শিশু দিনে দিনে বড় হ'তে থাক্, সেই অবসরে তোমাদের সঙ্গে দুটো কথা ক'য়ে নি।

ভারতবর্ষে বিষ্ণুগুপ্ত আজও আর দুটি নামে বিখ্যাত হয়ে আছেন—অর্থশাস্ত্রের লেখক কৌটিল্য এবং সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী চাণক্য ব'লে।

আর তাঁর পালিত-পুত্রের মত হাতে-গড়া ঐ শিশুকেই ইতিহাস আজ ভারতের প্রথম সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত নামে ডাকে!

তোমরা অনেকে নিশ্চয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের লেখা "চন্দ্রগুপ্ত" নাটক পড়েছ বা তার অভিনয় দেখেছ? কিন্তু তোমরা ভালো ক'রে জেনে রাখো যে, ঐ নাটকের চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে সত্যিকার ইতিহাসের চন্দ্রগুপ্তের মিল আছে খুব অল্পই। আসল চন্দ্রগুপ্তের গল্প একেবারে অন্যরকম!

এইখানে আর একটা কথাও ব'লে রাখি। চন্দ্রগুপ্তের প্রথম জীবন সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। আর একটি মত হচ্ছে এই: চন্দ্রগুপ্ত নাকি নন্দ-রাজার বিরাগভাজন হয়েছিলেন। রাজা তাঁর প্রাণদণ্ডের হুকুম দেন। চন্দ্রগুপ্ত মগধ ছেড়ে পালিয়ে উত্তর ভারতের সীমান্ত-প্রদেশে গিয়ে হাজির হন। এ মত গ্রীক ঐতিহাসিকের। আমরা কিন্তু এ-সম্বন্ধে বিদেশী লেখকের চেয়ে প্রাচীন ভারতীয় লেখকের

মতই অধিকতর নির্ভরযোগ্য ব'লে মনে করি। এখন আবার গল্প স্থুরু করবার সময় হয়েছে।

কয়েক বৎসর কেটে গেছে। চন্দ্রগুপ্ত এখন যুবা। কেবল দেহের নয়, তাঁর মনের যৌবনও অসাধারণ। চোখের সামনে সর্ব্বদাই তিনি বৃহত্তর ভারতের সমুজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেন। সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত তখন সনাতন হিন্দু আদর্শ হারিয়ে ফেলেছে। ভারতের অধিকাংশ ছোট ছোট খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত—কোম রাজ্যের সঙ্গে কোন রাজ্যের মিল নেই। আর্য্যাবর্ত্তের সব চেয়ে বড় রাজা হচ্ছেন নন্দ, কিন্তু অত্যাচারিত প্রজারা তাঁকে চায় না। চন্দ্রগুপ্ত কল্পনায় দেখেন, নন্দকে তাড়িয়ে মগধের সিংহাসনে বসেছেন তিনি এবং যত ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ রাজাকে দমন ক'রে ভারত জুড়ে এমন এক মহা-সাম্রাজ্য স্থাপন করেছেন যার মধ্যে হয়েছে নব-জাগ্রত আর্য্য-আদর্শের পূর্ণ-প্রতিষ্ঠা। বলা বাহুল্য, শিষ্যের মনে এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে দিয়েছেন চাণক্যই।

আজ থেকে তুই হাজার তিন শো বছরেরও আগেকার কথা—অর্থাৎ তখন পৃথিবীতে খৃষ্ট ও মুসলমান ধর্ম্মের স্বপ্নও কেউ দেখে নি। য়ুরোপে একমাত্র উল্লেখযোগ্য সভ্য জাতি ছিল পৌত্তলিক গ্রীকরা এবং ভারতের হিন্দুরাও তখন মূর্ত্তি গ'ড়ে ঠাকুর পূজো করত না।

এই সময়েই একদিন বাঁধ-ভাঙা বন্যা-প্রবাহের মত দিগ্বি-জয়ী আলেকজাণ্ডার সসৈন্যে ছুটে এলেন 'ভারত-বিজয় করতে।

উত্তর-ভারতের ছোট ছোট রাজারা তখন যদি একসঙ্গে মিলে-মিশে বাধা দিতেন, তা'হলে গ্রীকদের ভারতের ভিতরে আর ঢুকতে হ'ত না। কিন্তু তাঁরা প্রত্যেকই কম সৈন্য নিয়ে বোকার মত গ্রীকদের বিপুল বাহিনীকে বাধা দিতে গিয়ে খুব সহজেই একে একে হেরে গেলেন।

হয়তো চাণক্যের পরামর্শেই এই সময় চন্দ্রগুপ্ত কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলবার জন্যে আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে দেখা ক'রে বলেন, "মগধই হচ্ছে আর্য্যাবর্ত্তের সব-চেয়ে বড় রাজ্য, তাকে জয় না করলে ভারত জয় করা হবে না। আপনি যদি আমার সঙ্গে মগধে যান তাহ'লে অনায়াসেই নন্দকে হারিয়ে দিতে পারবেন, কারণ প্রজারা তার বিপক্ষে।" আলেক-জাণ্ডার উত্তরে কি বল্লেন তা প্রকাশ পায় নি। তবে উত্তর নিশ্চয়ই সন্তোষজনক হয় নি, কারণ তাঁর কাছ থেকে চন্দ্রগুপ্তকে হতাশ হয়ে ফিরতে হয়েছিল।

চন্দ্রগুপ্ত ও চাণক্য তখন দুইটি মহাব্রত গ্রহণ করলেন। একটি হচ্ছে মগধের সিংহাসন অধিকার করা এবং আর একটি হচ্ছে, ভারতের মাটি থেকে যবন ও গ্রীকদের তাড়িয়ে দেওয়া।

উত্তর-ভারত-সীমান্তে তখন যে-সব জাতি বাস করত, আজকের মতন সেদিনও তারা ছিল দুর্দ্ধর্ষ ও অত্যন্ত যুদ্ধপ্রিয়।

—তাকে জয় না করলে ভারত জয় করা হবে না।

দিও ধর্ম্মে তখন তারা হিন্দু ছিল, কিন্তু শাস্ত্র ফেলে স্ত্র নিয়েই তারা মরণ-খেলা খেলতে ভালোবাসত। ধরতে ালে তারাই ছিল ভারতের সিংহদ্বারের রক্ষক। গ্রীক, ার্সী, শক, হুণ ও মুসলমান দিগ্বিজয়ীরা ভারতে প্রবেশ রতে এসে বরাবরই তাদের কাছ থেকে পেয়ে এসেছে বাধার

পর বাধা। প্রচণ্ড রক্তসাগরে তাদের হাজার হাজার মৃতদেহ না ডুবিয়ে কেউ আর্য্যাবর্ত্তের ভিতরে ঢুকতে পারে নি। ভারতের সিংহদ্বার রক্ষা করবার জন্যে যুগে যুগে তারা যে কতবার আত্মদান করেছে, তার হিসাব কেউ লিখে রাখে নি চন্দ্রগুপ্ত তাদেরই ভিতর থেকে বেছে বেছে সৈন্য সংগ্রহ করতে লাগলেন। আয়োজন সম্পূর্ণ ক'রে স্বদেশে ফিরে এসে তিনি আক্রমণ করলেন ধন-নন্দকে। কিন্তু মগধের বিপুল বাহিনী তাঁকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেললে, তিনি পরাজিত হয়ে আবার উত্তর-ভারতে পালিয়ে গেলেন।

ইতিমধ্যে আলেকজাণ্ডারও উত্তর-ভারতের এক অংশ দখল ক'রে মগধের দিকে এগুবার আয়োজন করতে লাগলেন। কিন্তু মগধের বিপুল পরাক্রমের কথা শুনে গ্রীক সৈন্যরা ভয় পেয়ে এমন বিদ্রোহ প্রকাশ করলে যে, আলেক- জাণ্ডারের আর ভারত-বিজয় করা হ'ল না, উত্তর-ভারত রক্ষা করবার জন্যে চারিদিকে গ্রীক সৈন্য ও শাসনকর্ত্তা রেখে তিনি আবার স্বদেশে প্রস্থান করতে বাধ্য হ'লেন।

ওদিকে প্রথমবার বিফল হয়েও চন্দ্রগুপ্ত হাল ছাড়েন নি। পার্ব্বত্য জাতিদের ভিতর থেকে আবার তিনি নূতন একদল সৈন্য সংগ্রহ করলেন।

প্রাচীন নাটক "মুদ্রারাক্ষসে"র মতে চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী

গুরু চাণক্য এই সময়ে পার্ব্বত্য প্রদেশের পর্ব্বতক নামে এক শক্তিশালী রাজাকে নিজেদের দলভুক্ত করেন। জৈন ‘স্থবিরাবলিচরিতে’ও ঐ কথা পাওয়া যায় এবং বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতেও দেখা যায় চন্দ্রগুপ্ত পর্ব্বত নামে রাজার কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছিলেন। আধুনিক ঐতিহাসিকরা বলেন, ঐ পর্ব্বতক বা পর্ব্বত আলেকজাণ্ডারের কাছে পরাজিত বিখ্যাত বীর পুরু ছাড়া আর কেউ নন।

নানা প্রদেশের নানা জগতের লোকের ভিতর থেকে সৈন্য বেছে নিয়ে চন্দ্রগুপ্ত গ’ড়ে তুললেন এক প্রকাণ্ড বাহিনী! কিন্তু এবারে তিনি প্রথমেই মগধের দিকে গেলেন না, উত্তর-ভারতেই তুললেন গ্রীকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বজা! সীমান্ত ও পাঞ্জাবের দেশে দেশে তিনি ছুটতে লাগলেন অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করে, চতুর্দ্দিকে ভারতের শত্রু গ্রীকদের রক্ত ছড়াতে ছড়াতে! তাঁর বীরত্ব ও দেশভক্তির প্রেরণা লাভ ক’রে ভারতবাসীরাও জেগে উঠল প্রবল জাতীয় ভাবের তীব্র উদ্দীপনায়! বিপদ দেখে গ্রীক দস্যুরা যখন ভারতের মাটি ছেড়ে পালিয়ে প্রাণ বাঁচালে তখন সমগ্র উত্তর-ভারত চন্দ্রগুপ্তের করতলগত এবং তাঁর অধীনস্থ সৈন্যদলেরও সংখ্যা হয় না!

দেশের পর দেশ জয় করতে করতে চন্দ্রগুপ্ত আবার মগধে

ফিরে এলেন। ধন-নন্দের সঙ্গে আবার তাঁর যুদ্ধ হ'ল এবং সে-যুদ্ধে বিজয়ী হলেন চন্দ্রগুপ্তই। চাণক্যের প্রতিহিংসা শান্ত হ'ল—নন্দ সবংশে মারা পড়ল, চন্দ্রগুপ্ত আরোহণ করলেন পাটলিপুত্রের সিংহাসনে। এই চিরস্মরণীয় ঘটনার কাল হ'চ্ছে খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৩২৩ কি ৩২২ শতক।

কিছুদিন যেতে-না-যেতেই চন্দ্রগুপ্তের একছত্র সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন হ'ল সফল।

কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসন লাভের বছর পনেরো-যোল পরে আলেজাণ্ডারের সেনাপতি ও প্রাচ্য গ্রীক-সমাজ্যের অধীশ্বর সেলিউকস্ আবার এলেন ভারত-বিজয়ে। তবে এবারে ভারত আর একতাহীন ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল না। সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের অধীনে ছিল তখন আট হাজার যুদ্ধরথারোহী চব্বিশ হাজার সৈন্য, নয় হাজার রণহস্তীর সঙ্গে ছত্রিশ হাজার যোদ্ধা, ত্রিশ হাজার অশ্বারোহী ও ছয় লক্ষ পদাতিক! সেলিউকস্ সিন্ধুনদ পার হয়েছেন শুনে চন্দ্রগুপ্ত সসৈন্যে তাঁকে আক্রমণ করলেন এবং রক্তাক্ত যুদ্ধক্ষেত্রে ভারতের তরবারি করলে গ্রীক বীরত্বকে ভূমিসাৎ! পরাজিত সেলিউকস্ কাবুল, কান্দাহার, হিরাট ও মাক্রাণ্ প্রভৃতি রাজ্য ক্ষতিপূরণস্বরূপ চন্দ্রগুপ্তের হাতে ছেড়ে দিলেন—ভারতের সীমান্ত এগিয়ে গেল পারস্যের সীমান্ত পর্য্যন্ত!

সেইসঙ্গে সেলিউকস্ নিজের মেয়েরও সঙ্গে চন্দ্রগুপ্তের বিয়ে দিলেন,—রূপকথায় যাকে বলে, অর্দ্ধেক রাজ্যের সঙ্গে রাজকন্যা দান!

গ্রীক জীবনীলেখক প্লুটার্ক বলেন, সেলিউকস্‌কে হারিয়ে চন্দ্রগুপ্ত বেরিয়ে পড়লেন দিগ্বিজয়ে এবং নিজের ছয় লক্ষ সৈন্য নিয়ে সমস্ত শত্রুবধ ক'রে সারা ভারতের উপরে উড়িয়ে দিলেন বিজয়পতাকা! চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য হয়ে উঠল এত বড়, যার তুলনায় আজকের ইংরেজ-অধিকৃত ভারতবর্ষও ছোট বলা চলবে। অথচ আধুনিক ভারতবাসীর মুখবন্ধ করবার জন্যে ইংরেজেরা যখন-তখন বলে, 'আমাদের আগে ভারত-বাসীরা কখনো এত-বড় সাম্রাজ্যের মধ্যে একজাতির মত বাস করে নি!'

বড় বড় ঐতিহাসিকরা সবিস্ময়ে ব'লেছেন, চন্দ্রগুপ্ত একেবারে অনাথ ও সহায়সম্পদহীন হয়েও মহাপরাক্রান্ত ও বিশ্বজয়ী গ্রীকদের পরাজিত ও বিতাড়িত ক'রে ভারতকে সম্পূর্ণ-স্বাধীন করলেন প্রতাপশালী ও আর্য্যবর্ত্তের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজা ধন-নন্দকে হারিয়ে মগধের সিংহাসন দখল করলেন, ভারতব্যাপী সাম্রাজ্য স্থাপন করলেন এবং গ্রীক রাজ সেলিউকসের দর্প চূর্ণ ক'রে ভারতের বাইরেও বিপুল এক রাজ্য লাভ করলেন। মাত্র আঠারো বৎসরের মধ্যে এই-সব অসম্ভব কীর্ত্তি সম্ভবপর

ক'রে ভারতের ইতিহাসে আজও তিনি অতুলনীয় হয়ে আছেন!

সাম্রাজ্যকে অধিকতর দৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত আরো ছয় বৎসর কাল, রাজদণ্ড ধারণ ক'রে রইলেন বটে, কিন্তু সত্যিকার আর্য্যাবর্ত্তের রাজর্ষি তিনি, মন তাঁর ভরে গেল অসীম বৈরাগ্যে! ভারত-উদ্ধার ব্রত উথ্থাপিত হয়েছে, এখন মিথ্যা এই শক্তির মোহ, তুচ্ছ এই পার্থিব ঐশ্বর্য্য, ব্যর্থ এই যশ-মর্য্যাদা! পুত্র বিন্দুসারের হাতে সাম্রাজ্যর শাসন-ভার দিয়ে সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত রাজ-মুকুট খুলে ফেললেন, গ্রহণ করলেন সন্ন্যাসীর গৈরিক বস্ত্র এবং চ'লে গেলেন সুদূর দক্ষিণ-ভারতে, মহিশূরপ্রদেশ। তখনও তাঁর পঞ্চাশ বৎসর বয়স হয় নি! তাঁর মৃত্যুর বিস্ময়কর, কারণ অল্পদিন পরেই উপবাস-ব্রত নিয়ে স্বেচ্ছায় তিনি দেহত্যাগ করেন!

চন্দ্রগুপ্তের আবির্ভাব কবির কল্পনায় নয়, তিনি হচ্ছেন ঐতিহাসিক ব্যক্তি। এবং বিচার করলে বোঝা যাবে যে, একসঙ্গে বীরত্ব, মানবতা ও মহানতার কথা ধরলে পৌরাণিক ভীমার্জ্জুনেরও চেয়ে তাঁর মহিমা হচ্ছে উচ্চতর।

ষ্টেশনে এসে চিত্ররথ যখন নামলো হেমন্তের জ্যোৎস্নায় আর কুয়াশায় রাত্রি অপরূপ হয়েছে। ইতিমধ্যেই এদিকে শরীর সিরসির করে, শীত আসতে দেরী নেই।

বাঁশী বাজিয়ে অলসভাবে প্যাসেঞ্জার গাড়ী চলে গেল। আশ্চর্য্য ষ্টেশান, না একটা কুলি না কোনো যাত্রী! ষ্টেশন-মাষ্টার নিতান্ত অভ্যেসমত একবার বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। গাড়ীর সঙ্গে তিনিও উধাও হলেন। আর সেই

নির্জ্জন মাঠের মাঝখানে হেমন্তের কুয়াশা-জড়ানো রাত্রে, এক হাতে বেডিং অন্য হাতে চামড়ার স্যুটকেস নিয়ে নিজেকে হঠাৎ যেন ভার অসহায় বলে মনে হল। কিন্তু তা মুহূর্ত্তের জন্যে। তারপরেই চিত্ররথের হাসি পেলো: তার মত কত ছেলে তো চাকরি নিয়ে ভারতবর্ষের বাইরে চলে যাচ্ছে : কত দুর্গম অরণ্য আর অজানা দেশ। বিপদ প্রতি পদে। আর সে কিনা বাংলাদেশের এক ছোটো পাড়াগাঁয়েতে এসেই ভয় পেলো? আর কাজ তো ভারি, জমিদারের নায়েবের কাজ। মাইনে যা দেবে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলো এই বাজারে সরকারি আপিসেও সহজে তা পাওয়া যায় না। তবে এরা উচ্চ-শিক্ষিত লোক চায়, আর মনে মনে ভেবে চিত্ররথ নিজেকে জমিদারের নায়েব হিসেবে উচ্চশিক্ষিত বলেই মনে করলো। সে বি-এ পাশ। এই যথেষ্ট।

চিঠিতে জেনেছিল ষ্টেশান থেকে গ্রাম মাইল তিনেক পথ। গাড়ী পাঠাবার কথা ছিলো। গাড়ী এসেছে কিনা দেখবার জন্যে চিত্ররথ বাইরে এলো।

কী কাণ্ড! গরুর গাড়ী হাজির। তার মধ্যে লোকটা দিব্বি আরাম করে ঘুমুচ্ছে! মনে মনে সে বেশ খানিকটা সুস্থ বোধ করলো, দুর্ভাবনাও গেল।

"ওহে শুনছো," ঠেলা দিয়ে চিত্ররথ চেঁচিয়ে উঠলো।

"আজ্ঞে বাবু ?" ধড়মড় করে উঠে বসলো লোকটা, "কতক্ষণ এলেন ?"

"আমার নাম চিত্ররথ। নতুন নায়েবের চাকরি নিয়ে এসেছি। এ কি জমিদারবাবুর গাড়ী ?"

"আজ্ঞে বাবু।"

"যাও তাহ'লে, আমার বিছানা আর বাক্সটা নিয়ে এসো। প্ল্যাটফর্ম্মে পড়ে রয়েছে।"

লোকটা চলে গেল। আশ্চর্য্য ষ্টেশন যা হোক্। টিকিট-কালেক্টার কখন পালিয়েছে। বিনা টিকিটে এলেও ধরবার কেউ নেই।

লোকটা বিছানা আর সুটকেস গাড়ীতে তুললো। ততক্ষণে চিত্ররথ কোটের কলার উল্টে সিগারেট ধরিয়ে এই ক'. মাইল পথ হেঁটে যাবে বলে ঠিক করেছে। কিন্তু কি ভেবে সে গাড়ীতে উঠে বসলো। উঁচু-নীচু পথ দিয়ে বিচিত্র শব্দ করতে করতে চললো গরুর গাড়ী—হেমন্তের কুয়াশায় আর জ্যোৎস্নায় সব একাকার। ভালো করে কিছু বোঝা যায় না। গাড়ীর দোলানিতে আর গাড়োয়ানের বিচিত্র শব্দে গরু দুটোকে দ্রুত চালাবার চেষ্টায় যে কোনো সহুরে লোকের বিরক্ত ধরে। কিন্তু চিত্ররথ তখন অন্য কথা ভাবছিলো।

এই নায়েবির চাকরির বিজ্ঞাপন সে অনেকদিন দেখছে। মাঝে একবার বন্ধ হয়েছিল। তার ছেলেবেলার বন্ধু বিনয় পেয়েছিল চাকরিটা। কিন্তু দিন সাতেক পরে সে ফিরে এলো। চোখমুখ বসে গেছে, চুল রুক্ষ। সোজা এসেছিল সে চিত্ররথের বাড়ী।

"কি রে! ফিরে এলি যে! আর এই চেহারা?"

"আর ভাই, চাকরি আমার পোষালো না। এই বাজারে যদি বা পেলুম, তা এমন চাকরি যে জীবন নিয়ে টানাটানি।"

"মানে?"

"মানে আর কি। পুরোনো নায়েবের বদলে আমি গিয়েছিলুম সে আস্ত একটা ডেভিল। তার চোখ দুটো দেখলেই বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়। লোকটা বেজায় বদ্-মেজাজী আর পয়লা নম্বরের চোর। ভেতরে ভেতরে ইতিমধ্যেই সে অনেক সম্পত্তি গ্রাস করছে। তার ওপর সন্দেহ হওয়ায় জমিদার অন্য নায়েবের জন্যে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। লোকটার চাকরি গেছে। কিন্তু রাগ যায় নি। এই দুর্দিনে চাকরির লোভে পড়ে আমাদের মত অনেক বি-এ এম-এ পাশ ছোকরারা গিয়েছিলো। দু' দিনও কেউ টেঁকতে পারে নি। লোকটা প্রথমত নিজে এসে বার কয়েক শাসায়। বলে চলে যেতে। না গেলে নাকি অনিষ্ট হবে।

যারা তার ভয়ে পালিয়ে আসে তাদের বিশেষ কিছু হয় না। কিন্তু যারা শোনেনি তারাই অদ্ভুত বিপদে পড়েছে। আমি এ রকম দু' জনের খবর শুনলুম। একজনকে সকালবেলায় মাঠে পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছিলো—জামা কাপড় ছেঁড়া, একটা হাত ভেঙে গিয়েছে আর গলায় অদ্ভুত সরু সরু আঙুলের দাগ। সে বেচারি হাসপাতালে মারা গেল। আর একজন মরেনি, তবে সাঙ্ঘাতিক জখম হয়ে ফিরেছিলো। সে বলেছিলো রাত্রে কি কাজে সে মাঠের আল দিয়ে যাচ্ছিল। বিশেষ আলো ছিলো না, হঠাৎ যেন নিকষ কালো একটা মানুষ তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। চোখ দুটো তার হলদে আর ঘোলাটে। লম্বায় সাত ফিট্ হবে। আঙুলগুলো লিকলিকে। শরীরটাও তাই। আর কিছু সে পারে নি। কারণ এরপর তার জ্ঞান ছিল না।"

"বল কি হে?" চিত্ররথ লাফিয়ে উঠেছিল। "বাংলাদেশেই এমন চমৎকার এ্যাডভেঞ্চারের সুযোগ! তা তুমি পালিয়ে এলে কেন? সেই লিক্‌লিকে লোকটার পাল্লায় পড়েছিলে নাকি? ভালো কথা, লিক্‌লিকে লোকটি যে কে তা তো বললে না?"

"সেটাই তো মস্ত সমস্যা। গ্রামে প্রবাদ লোকটা নাকি প্রেতসিদ্ধ। তার আদেশে ভূত-প্রেত কাজ করে। যে কেউ

নায়েবির চাকরির জন্যে যায় তার উপরেই ভূত ছাড়ে। কিন্তু লোকটা প্রেতসিদ্ধ-টিদ্ধ না হোক আমি তার বাড়ীতে দেখেছি নানা অদ্ভুত সমস্ত জিনিস। মিশরের নানা প্রাচীন দেব-দেবীর কাঠের মূর্ত্তি, পুরোনো পুঁথি, এমন কি গোটা কয়েক মমি পর্য্যন্ত! লোকটা নাকি প্রাচীনকালের নানাভাষা সম্বন্ধে অগাধ পড়াশুনা করেছে। তার বাড়ীতে গেলেই এ কথা ভাল করে বোঝা যায়।—হ্যাঁ, যা বলছিলুম। আমি সেখানে পৌঁছুবার পরের দিনই একটা চাকর আমাকে চিঠি দিয়ে গেল। দেখি নায়েব লিখেছে: বিকেলে তার ওখানে যেন চায়ের নেমন্তন্নে যাই। অবাক্ হলুম। পরে শুনলাম ওই চাকরির জন্যে যে কেউ গেলেই নায়েব প্রথমে তাকে নেমন্তন্ন করে ভালো করে বলে চলে যেতে, নইলে বিপদ হবে। আমি প্রস্তুত হয়েই গেলুম। আর লোকটা যখন ঘুরিয়ে ভয় দেখাতে চাইলো তখন আমি সোজাই বলে দিলুম: ও সব হবে-টবে না। তার যা খুসি করতে পারে। আমি থাকবোই। মুহূর্ত্তেই লোকটার ভদ্রতার খোলস মিলিয়ে গেল। বললো, 'আচ্ছা ছোকরা বাড়ী যাও। দেখবে এর ফল। তুমি তো তুমি, তোমার জমিদারকেও দেখে নেবো। আমাকে যখন চোর বলে তাড়িয়েছে দেখবে শেষ পর্য্যন্ত সম্পত্তিই আমার হবে। আমি নোবো নোবো

নোবো। সব্বাইকে নিয়ে মরবো।' তার চোখ দুটো যেন ধ্বক ধ্বক করে জ্বলতে লাগলো। আর কি জানি কেন ভয়ে আমার শরীর যেন কাঠ হয়ে গেল। বাড়ী ফিরে সোজা জমিদারের কাছে গেলুম। বললুম, 'কেন আপনি পুলিশের সাহায্য নেন না?' হেসে তিনি বললেন, 'পুলিশের সাহায্য তো নিয়েছিলুম। আমার দরখাস্ত পেয়ে খোদ পুলিশ সায়েব এসেছিলেন। কিন্তু লোকটা কি কম সয়তান। রাত্রে সে পুলিশ সায়েবকে নেমন্তন্ন করলো। সে বিরাট এক আয়োজন। আর পুলিশ সায়েবের সঙ্গে যখন সে খানা খাচ্ছিল তখনি খবর এলো আর একজন জখম হয়েছে। তাছাড়া পুলিশ চোর-জোচ্চোরের বিরুদ্ধে লড়ে, কিন্তু ভূত-প্রেতের বিরুদ্ধে তো নয়। ভূতপ্রেতের কথা শুনলে হেসেই উড়িয়ে দেয়। কি বিপদেই যে পড়েছি। কোনো একটা প্রমাণ পাওয়া যায় না কে এসবে আঘাত করে।'—যাক, সে রাত্রেই কিন্তু আমি ভীষণ ভয় পেলুম, অল্পর জন্যে বেঁচেও গেলুম বলতে পারো। আমি বেড়িয়ে ফিরছিলুম। গ্রামের পথ। সন্ধ্যে হলেই নির্জ্জন। তাছাড়া ষ্টেশান থেকে যে পথ গ্রামে এসেছে সে পথে রাত্রে বড় একটা কেউ যাতায়াত করে না। সেখান দিয়েই আস্‌ছিলুম, বোধ হয় তখনো এক ফার্লঙ বাকী আছে গ্রামে পৌঁছুতে, এমন সময় মনে হল কিছু

দূরে যেন শুক্‌নো পাতার শব্দ। চম্‌কে ফিরে চাইতেই আবছা দেখলুম, বিশ্বাস কর সত্যিই দেখলুম, লিক্‌লিকে চাবুকের মত একটা লোক। তার ডান হাতটা সামনে বাড়ানো। প্রায় সাতফিট্ হবে। আশ্চর্য্য ক্ষিপ্রতায় শুক্‌নো পাতার মত তার হাল্‌কা পায়ের শব্দ করে আমার দিকে ছুটে আস্‌ছে। তার চেহারায় এমন একটা অসম্ভব কিছু আছে যা দেখলেই বুকের ভেতরটা হিম হয়ে যায়। তুমি তো জানো আমি দৌড়ুতে খুব ভালো পারি। কিন্তু সে রাত্রেই বোধ হয় জীবনে সবচেয়ে জোরে ছুটেছিলুম। বিশ্বাস কর, আমার এতো কাছে জীবটা এসেছিলো যে একটা ঠাণ্ডা নিঃশ্বেস যেন পিঠে পেয়েছিলুম। কপাল খুব ভালো, আমাকে ছোঁবার আগেই হুড়মুড় করে আমি নায়েবের বাড়ীতেই ঢুকে পড়্‌লুম।—কারণ প্রথমেই নায়েবের বাড়ী আর ভালোমন্দ ভাববার সময় যখন নেই। বাইরের অন্ধকার ঘরে লোকটা বসে তামাক খাচ্ছিলো। আমাকে দেখেই লাফিয়ে এলো। জিগ্‌গেস্ করলো, 'কি হয়েছে?' আর আমি কিছু বলবার আগেই ঝড়ের মত কে যেন বৈঠকখানার পাশের ঘরে ঢুকে গেল। অন্ধকারে কিছু বোঝা গেল না বৈঠকখানার পাশের ঘরটাই লাইব্রেরী। বিরাট্ ঘর আমার কি রকম যেন সন্দেহ হল। কিন্তু প্রাণ নিয়ে ফিরে

পারলেই তখন খুসি। আমার সন্দেহ মনেই রইল। 'নায়েবকে বললুম, কালকেই যাবো মশাই। আপনাদের ঝগড়ার মধ্যে এসে আমি প্রাণটা খোয়াই কেনো।' লোকটা হেসে বললো, আর সেই অন্ধকারেও জমিদারের উপর বিকট রাগে মুখটা যেন তার বেঁকে গেল আমি বুঝতে পারলুম, 'যাক্ সুবুদ্ধি হয়েছে। দেখি কত্তামশাই আবার কাকে আনান! জানো সব্বাইকে আমি পিষে মারতে পারি। সে রকম শক্তি আমার আছে! খুব বেঁচে গেলে তুমি। কালই এ গ্রাম ছাড়ো। আর এ মুখো হয়ো না, বুঝলে?'—তার পরদিনই চলে এলুম। কী দরকার অনর্থক প্রাণটা খুইয়ে?"

এর পরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত। সবাইকার অনুরোধ উপেক্ষা করে চিরকেলে একরোখা ছেলে চিত্ররথ সেই নায়েবির চাকরির জন্যে দরখাস্ত দিলো এবং পেলো, আজ রাত্রে সে পৌঁছুলো গ্রামে। গাড়োয়ানকে শুধু সে বলেছিলো নায়েবের বাড়ীটা যেন তাকে দেখিয়ে দেওয়া হয়। দূর থেকে গাড়োয়ান দেখিয়ে দিলো। বাড়ীটা একতলা হলেও বিরাট। হেমন্তের কুয়াশায় আর জ্যোৎস্নায় ভালো করে বোঝা না গেলেও চিত্ররথের মনে হল বাড়ীটার কোনোখান দিয়ে কে যেন জ্বলন্ত ধ্বক্‌ধ্বকে চোখ দিয়ে তাকে লক্ষ্য করছে।

কিন্তু দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দেবার ছেলে সে নয়। তার

সবল দেহ এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে যেন বিদ্রোহ করে দাঁড়ালো। পৌঁছুলো সে জমিদার বাড়ীতে। সেখানেই তার থাকার ব্যবস্থা হয়েছে।

দুই

তখন মাঝরাত্রি পেরিয়ে গেছে। বিছানায় চিত্ররথ উঠে বসলো। কোথাও সাড়াশব্দ নেই। মাথায় একটা মৎলব এখানে এসে পর্য্যন্ত ঘোরাঘুরি কর্ছে। কোনো শব্দ না করে বিছানা ছেড়ে সে উঠ্লো আর কয়েক মিনিট পরেই তাকে দেখা গেল আঁটসাঁট জামা-কাপড় পরে এক হাতে ছোটো টর্চ্চ ও কোমরে খাপে ভরা ধারালো ভোজালিটা গুঁজে নিঃশব্দে সে নায়েবের বাড়ীর নিকটে এগিয়ে যাচ্ছে। নায়েবকে সে দেখেনি আর ভুতুড়ে ব্যাপারও কিছু সে বিশ্বাস করে না। তবু কেন যেন তার মনে হয়েছিলো নায়েবের এই বদ্মায়েসির পেছনে কোনো অস্বাভাবিক ক্ষমতা লুকিয়ে আছে।

বাড়ীটা চিন্তে বিশেষ দেরী হল না তার। বিরাট বাড়ী। কাছে এসে আরো অনেক বড় বলে মনে হল। সাম্নের দিকটা সারানো হয়েছে। পেছনটা অনেকটা পোড়ো বাড়ীর মত।

গ্রামে কেউ জেগে নেই, বেশ বোঝা যায়। চিত্ররথের ইচ্ছে ছিল লুকিয়ে এ বাড়ীটা একবার পরীক্ষা করে। যদি কোনো গুণ্ডা ধরণের কাউকে নায়েব বাড়ীতে রাখে এ সময়েই তার সঙ্গে নায়েবের দেখা হওয়া সুবিধেজনক—যখন পৃথিবীতে কেউ জেগে নেই।

বাড়ীর দরজা জান্‌লা ভালো করে বন্ধ। নায়েব ছাড়া আব কেউ সেখানে থাকে না। একটা চাকর কাজকর্ম্ম করতে আসে। প্রায় সমস্ত দিন থাকে। কিন্তু রাত্রে তার ছুটি। রাত্রে এই বিরাট বাড়ীটায় নায়েব একা থাকে। কেন একা থাকে কেউ জানে না। গ্রামের মধ্যে গুজোব নায়েব বাড়ীতেই রাত্রে শবসাধনা করে।

চিত্ররথ আরো খানিক বাড়ির আশেপাশে ঘুরে বেড়ালো। হেমন্তের আকাশে চাঁদ ডুবলো। ফিকে কুয়াশায় অন্ধকাব আরো গাঢ় হয়েছে। মাঝে মাঝে চুপিচুপি আলো জ্বালিয়ে সে পথ দেখতে লাগলো।

সব জান্‌লাগুলো সে পরীক্ষা করলো। কিন্তু ভেতরে যাবার কোনো সুবিধে নেই তাদের মধ্যে দিয়ে। শুধু একটা জান্‌লার ছোট্ট গর্ত্ত দিয়ে সামান্য আলো আস্‌ছে। সেখানে সে দাঁড়ালো। কার যেন অস্পষ্ট স্বর শোনা যাচ্ছে। কার্ণিসে দাঁড়িয়ে জান্‌লায় কান লাগিয়ে চিত্ররথ শুনতে

লাগ্‌লো। অস্পষ্ট গম্ভীর গলায় কে যেন কি পড়্‌ছে আর ঘরের মধ্যে হাল্কা খস্‌খস্‌ একটা শব্দ ছড়িয়ে পড়্‌ছে। অকস্মাৎ তার বিনয়ের কথা মনে পড়লো: শুক্‌নো পাতার মত খস্‌খসে শব্দ! ঠিক। আর কেন, চিত্ররথ নিজেই বুঝতে পার্‌লো না, তার সমস্ত গায়ে যেন কাঁটা দিয়ে উঠ্‌লো! আরো খানিক সে দাঁড়ালো: সেই একটানা বিড়বিড় শব্দ আর ঝোড়ো বাতাসে উড়ে যাওয়া শুক্‌নো পাতার মত খস্‌খসে কার পায়ের শব্দ!

তিন

পরের দিন যথা নিয়মে চিত্ররথ নিমন্ত্রিত হল নায়েবের বাড়ী। লোকটার গোঁ আর স্পর্দ্ধা দেখে মনে মনে সে বিস্মিত হলো। জমিদারের গ্রামে সামান্য প্রজা হয়ে এক-রকম প্রকাশ্যে কি করে যে সে বিদ্রোহ কর্‌তে পারে তা ভাবতেই অবাক লাগে! সে প্রস্তুত হয়েই ছিল এ নিমন্ত্রণের জন্যে। তাই বিকেল হলে বেড়াবার ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে নায়েবের বাড়ীতে সোজা হাজির হল।

দীর্ঘ বলিষ্ঠ গড়নের চেহারা এই নায়েবের। আলখাল্লা জাতীয় একটা জামা গায়ে দিয়ে ইজিচেয়ারে গড়গড়ার নল মুখে দিয়ে যেন তারই অপেক্ষা সে কর্‌ছিলো।

"এই যে। আপ্‌নিই বুঝি কল্‌কাতা থেকে এসেছেন ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ," সবিনয়ে উত্তর দিয়ে ছড়িটা কোণে রেখে চিত্ররথ তার পাশের চেয়ারটায় বসলো আর নায়েবকে অন্য কোনো কথা বল্‌তে না দিয়ে বল্‌লো, "এখানে যিনিই এসেছেন তিনিই আপ্‌নার আতিথেয়তার সুখ্যাতি করেছেন। তারা আরো বলে আপ্‌নার লাইব্রেরী আর কিউরিও-কালেক্‌শানও নাকি দস্তুরমত রেয়ার। আপ্‌নি নাকি এ-বিষয়ে অনেক পড়াশুনোও করেছেন।—বিনয়ের মুখে বিশেষ করে আপ্‌নার কথা শুন্‌লুম। তাই দেখ্‌বার লোভ সাম্‌লাতে পার্‌লুম না। চলে এলুম।"

গড়গড়ায় টান দিতে দিতে একটু বাঁকা হেসে নায়েব বল্‌লো, "ঠিকই শুনেছেন। এখানে যখন এসেছেন তখন আমার সঙ্গে ভালো করে আলাপ হবেই। কিন্তু আমি বলি কি সখ করে কেন বিপদ ডেকে আন্‌লেন। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যান। সেই ভালো হবে।"

হোঃ হোঃ করে হেসে চিত্ররথ বল্‌লো, "সে কি কথা ? অতদূর থেকে কি মিথ্যেই এলুম ? কিন্তু যাক্‌, ও তর্কের কোনো মীমাংসা হবে না। কারণ আমিও আপ্‌নাকে খানিকটা বুঝতে পেরেছি, আর সব খবর শুনেও আমি এখানে আসায় হয়তো আপনিও আমার কিছু কিছু পরিচয় পেয়েছেন।

এখন এসেছি বন্ধু ভাবে এবং বন্ধু ভাবে বিদায় নেওয়াই ভালো। চলুন বরঞ্চ আপ্‌নার কিউরিও কালেক্‌শান্‌স্‌ কিছু-কিছু আমাকে দেখান। সামান্য এ বিষয়ে পড়াশুনোও করেছি। দেখ্‌তে খুব ইচ্ছে করছে।"

"বেশ, তাই ভালো," ইজিচেয়ার ছেড়ে নায়েব উঠে দাঁড়ালো আর পথ দেখিয়ে পাশের ঘরে নিয়ে এলো তাকে। ঘরে ঢুকেই চিত্ররথ বিস্মিত হল, যতটা আশ্চর্য্য হবে মনে করেছিলো তার চেয়ে অনেকটা বেশী। কে জান্‌তো বাংলা দেশের এক অখ্যাত গ্রামে সে মিসর দেশের চার পাঁচ হাজার বছর আগেকার সভ্যতার নিদর্শন দেখতে পাবে! সমস্ত ঘরে, যাকে বলে তিল ধর্‌বার স্থান নেই। মিসরের প্রাচীন দেব-দেবীর মূর্ত্তি থেকে আরম্ভ করে, নানা ধরণের পুঁথির পাণ্ডু-লিপি, এমন কি খোদ একটা মমি পর্য্যন্ত। ঘরেই এলেই একটা ভ্যাপ্‌সা গন্ধে সমস্ত মাথা ঝিম্‌ ঝিম্‌ করে। চিত্ররথ উৎসাহিত হয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লো। অনেক খুঁটিনাটি প্রশ্ন সে কর্‌লো আর ক্রমশঃ নায়েবের সেই ভারিক্কি গাম্ভীর্য্যও অদৃশ্য হল। উৎসাহী ছাত্র পেয়ে মন খুলে সে যেন কথা বলে চল্‌লো।

শেষে তারা মমির কাছে এসে দাঁড়ালো। মমির কালো কাঠের কেস্‌টা জান্‌লার পাশেই বসানো। আর

সেই জান্‌লার দিকে চেয়ে অকস্মাৎ চিত্ররথের মনে হল কাল রাত্রে বাড়ীর বাইরে থেকে এই জান্‌লার পাশেই সে কান

শেষে তারা মমির কাছে এসে দাঁড়ালো।

সজাগ করে দাঁড়িয়েছিলো। আর মুহূর্ত্তের মধ্যে একটা সন্দেহে তার সমস্ত শরীরে যেন বিদ্যুৎ বয়ে গেল !—ঠিক ! কিন্তু এও কি সম্ভব ? এই বিংশ শতাব্দীতে ?

মমিটার রঙ্ গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ। তার ফাঁকা চোখের গর্ত্তে বাদামের মত ছোটো ঠাণ্ডা মৃত দুটি চোখ। মাথার চুল ঘাড় বেয়ে বুকের ব্যাণ্ডেজের ওপর এসে পড়েছে। সমস্ত চাম্ড়া তার কুঁচকে কুঁক্‌ড়ে হাড়গুলোকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরেছে যেন। তার নীচের ঠোঁটের ওপর দুটো ধারালো হলদে দাঁত বেরিয়ে রয়েছে, অনেকটা ইঁদুরের দাঁতের মত। মমিটার দেহে অদ্ভূত কাপড়ের মত এক ধরণের কাপড়ের ব্যাণ্ডেজ, খানিকটা এখনো যেন খোলা হয় নি। বুকের নীচে, যে জায়গাটায় কোনো আবরণ নেই, বেশ বড় একটা ক্ষতচিহ্ন। সেখান দিয়েই চার হাজার বছর আগে মিশর দেশের কোনো ডাক্তার ওষুধপত্র দিয়েছেন, কাঠের কেস্‌টায় সাম্‌নে কাঁচের ডালা। সেই ডালার ওপর হল্‌দে গুঁড়ো গুঁড়ো কি সমস্ত যেন লেগে রয়েছে।

"আমি এর নাম জানি না," মমিটাকে দেখিয়ে নায়েব বল্‌লো, "এদের দেহে যেখানে নাম লেখা থাকে অসাবধান ভাবে নাড়াচাড়া করায় সে জায়গাটা পড়া গেল না।"

"জীবন্ত অবস্থায় এ বিরাট পুরুষ ছিল।" মমির দিকে চেয়ে চিত্ররথ বল্‌লো।

"নিশ্চয়ই! জায়েণ্ট্ বলা যায়। ছ' ফিট্ এগার ইঞ্চি এখনও লম্বায়। তাছাড়া এর মোটা মোটা হাড়গুলো দেখুন।

কে জানে হয়তো চার হাজার বছর আগে পিরামিড্ গড়ার সময় এ সাহায্য করেছিলো !—বছর দশেক আগে কল্‌কাতায় এক নিলামে দেড়শো টাকায় একে আমি কিনেছিলুম। সেই থেকে আমার কাছেই আছে। এর ব্যাণ্ডেজ্ আমি খুলেছি বহুবার। নাড়াচাড়াও করেছি। এই ছ' ফিট্ এগারো ইঞ্চির লোকটা কিন্তু আশ্চর্য্য হাল্কা। অবশ্য সব মমিই হাল্কা হয়···”

মমিটির দিকে চেয়ে পরীক্ষা কর্‌তে কর্‌তে চিত্ররথ বল্‌লো, “এখন হেঁটে বেড়াতে পার্‌লে হয়তো বাতাসে-ওড়া শুক্‌নো পাতার মত এর পায়ের শব্দ শোনাতো।”

কথাগুলো বলেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নায়েবের দিকে চিত্ররথ চাইলো আর স্পষ্টই লক্ষ্য কর্‌লো লোকটা ভীষণ চম্‌কে উঠে আশ্চর্য্য ক্ষমতায় নিজেকে সাম্‌লে নিল। তারপর শুক্‌নো শ্লেষের হাসি হেসে চিত্ররথ বল্‌লো, “আপনি দেখছি শুধু নায়েব হবার উপযুক্ত নন, কবি হবারও! কিন্তু এ হেঁটে বেড়াতে পারলে খুব সহজ লোক হত বলে মনে কর্‌বেন না, যতই কেন শুক্‌নো পাতার মত এর পায়ের শব্দ হোক্ !—যাক্, পাশের ঘরে চা বোধ হয় ঠাণ্ডা হয়ে গেল। চলুন যাওয়া যাক্।” কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় জোর করেই চিত্ররথকে সে পাশের ঘরে নিয়ে এলো। স্পষ্টই বোঝা গেল এ বিষয়ে আলোচনা দীর্ঘ কর্‌তে সে প্রস্তুত নয়।

খাওয়া শেষ হলে চিত্ররথ বাইরে এসে দাঁড়ালো। নায়েব বল্‌লো, "আচ্ছা চিত্ররথবাবু, আর একবার ভেবে দেখবেন। অবশ্য আপ্‌নি যদি যেতে না চান তা হলে আমার আর বলার কিছু নেই। কিন্তু চাক্‌রির মায়া কাটিয়ে চলে গেলেই ভালো কর্‌তেন।"

সামান্য হেসে চিত্ররথ বল্‌লো, "ধন্যবাদ—আপ্‌নার খাওয়ানো আর উপদেশের জন্যে। বর্ত্তমানে বেড়িয়ে আসি। শুনেছি আপ্‌নাদের দেশে বেড়ালে লোহা সুদ্ধু হজম হয়ে যায়—আপনার উপদেশ তো দূরের কথা!"

বেড়াবার পথ অবশ্য বেশী নেই। হয় মাঠ ভেঙে আলের ওপর দিয়ে ঘুরে বেড়ানো নয় তো ষ্টেশনের পথে যাওয়া। কিন্তু মাঠে বেড়াতেই চিত্ররথের ভালো লাগে। মিনিট পনেরো সে মাঠের দিকে এগিয়ে চল্‌লো তারপর শূন্য হাতের দিকে লক্ষ্য পড়ায় তার বেড়াবার ছড়ির কথা মনে পড়্‌লো। খালি হাতে বেড়ানো ঠিক নয়; সাপ-খোপও থাক্‌তে পারে তো! সে ফিরে এলো নায়েবের বাড়ী। সেখান থেকে বেরুবার সময় ছড়িটা ফেলে এসেছিল।

তখন সবে সন্ধ্যে হয়ে আস্‌ছে। নায়েবের চাকর চলে গেছে। কড়া ধরে খানিক নাড়ালো চিত্ররথ। কোনো উত্তর নেই। শুধু দরজাটা ধীরে ধীরে খুলে গেল। সে

ভীষণ আশ্চর্য্য হল। নায়েবমশাই কি দরজা বন্ধ করতে ভুলে গেছে? বার দুই নায়েবের নাম ধরে সে ডাকলো। কোনো উত্তর নেই। সে জানে ছড়িটা ঘরের এক কোণে রেখে গিয়েছিল। আবার ছড়ির জন্যে কাল কে আসে এই ভেবে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢোকাই সে স্থির করলো।

ছোট্ট টর্চ্চ জ্বালিয়ে ছড়িটা খুঁজতে তার বিশেষ অসুবিধে হল না। ছড়িটা হাতে দিয়ে নিছক কৌতূহলের খাতিরে পাশের ঘরটায় সে আলো ফেললো। ঘরের অন্ধকারকে চিরে আলো সেই মমি-কেসটায় পড়লো। আর দারুণ বিস্ময়ে চিত্ররথের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো: মমি-কেস্ খালি ; খানিক আগে দেখা মমির চিহ্নও সেখানে নেই!

তবে কি, তবে কি তার সন্দেহ মিথ্যে নয়?

চার

এর মধ্যে দিন দুই কেটে গেছে। ইতিমধ্যে কলকাতায় টেলিগ্রাম করে চিত্ররথ একটা উৎকৃষ্ট ছোট্ট রিভলভার ও এক বাক্স কার্ট্রিজ আনিয়েছে। আজই সেগুলো দুপুরে এসে পৌঁছুলো। তার কর্ত্তব্য মনে মনে ঠিক করে ফেলেছে চিত্ররথ। দুর্দ্দান্ত, দুরন্ত,একরোখা ছেলে সে।

কাউকেই কিছু সে বল্‌লো না।

সেই রাত্রেই হাফ্‌-প্যাণ্ট আর শার্ট পরে রিভলভারের চেম্বারে ছ'টা কার্টিজ ভরে সেটা সে পকেটে ফেল্‌লো ভোজালিটা বেল্টে আট্‌কালো, আর তার ছোট্ট টর্চ্চটা হাতে নিয়ে নিঃশব্দে যখন সে বেরিয়ে পড়লো তখন গ্রামে আর কেউ জেগে নেই। শুধু হেমন্তের কুয়াশায় জড়িয়ে আকাশে অপরূপ জোৎস্না।

ধীর নিঃশব্দে পা ফেলে সে নায়েবের বাড়ীতে এলো। বিরাট, স্তব্ধ বাড়ী। কোথাও শব্দ নেই। শুধু জান্‌লার সেই ফুটো দিয়ে সামান্য আলোর ইসারা চোখে পড়ে।

কোনো দ্বিধা না করে সে দরজায় ধাক্কা দিলো বেশ জোরে। গুম্‌গুম্‌ করে উঠলো সমস্ত বাড়ীময় প্রতিধ্বনি। মুহূর্ত্ত পরে দেখা গেল নায়েবকে : আলখাল্লা চাপিয়ে দরজা খুলে দাঁড়িয়েছে। উৎকণ্ঠায় আর বিরক্তিতে চোখ দুটো তার ধ্বক্‌ধ্বক্‌ করছে। চিত্ররথ প্রস্তুত ছিলো। এক ধাক্কায় নায়েবকে ভেতরে ঠেলে দিলো। এক হাতে টর্চ্চ অন্য হাতে ঝক্‌ঝকে রিভলভার, আর পরের মুহূর্ত্তেই দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে বল্‌লো : "Hands up, please".

নায়েব হাত দুটো মাথায় তুলে বল্‌লো, "মানে, এর মানে কি?"

"চুপ্।" চিত্ররথ প্রায় ধমক দিয়ে উঠ্লো। "যা বল্ছি করুন। কথা না শুনলে গুলি চালাতে বাধ্য হব।" দরজা থেকে সরে এসে সে বল্লো, "ভেতর থেকে খিল তুলে দিন। But, mind you, no more dirty tricks with me."

দর্জার খিল বন্ধ হলে চিত্ররথ বল্লো, 'বেশ। চলুন এবার আপ্নার মিউজিয়ামে।"

"এর মানে কি ?"

"Shut up. চলুন। না-না, হাতে দুটো মাথা থেকে নামাবেন না।"

তারা পাশের ঘরে এলো। মাঝখানে গোল একটা টেবিল। একটা চেয়ার সেখানে। টেবিলে কেরোসিনের ল্যাম্প জ্বল্ছে, ওপরে স্তূপাকার কাগজ। চিত্ররথ বিনা-বাক্যব্যয়ে সেখানে এগিয়ে গেল, এক হাত দিয়ে সমস্ত কাগজগুলো মেঝেয় ফেলে দিলো। তারপর হাতের রিষ্ট্ওয়াচটা • আর পকেটের ভোজালিটা টেবিলে রেখে রিভলভারটা বাগিয়ে ধরে বল্লো : 'আপনার বিরুদ্ধে কোনো law খাট্বে না জানি, কারণ আদালতে আপ্নার activities প্রমাণ করা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু আমার নিজের যে নিয়ম তা যেমনই সহজ তেমনি কার্য্যকারী। যদি পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমার কথামত কাজ করতে রাজী না হন,

তা' হলে ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি আপ্নার খুলির ভেতর দিয়ে বুলেট চালাতে বাধ্য হব।"

"আমাকে তুমি খুন কর্বে ?"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু, কারণটা কি ?"

"তোমার বদমায়েসির ওপর যবনিকা টান্তে।" চিত্ররথও তাকে 'তুমি' বলে কথা বল্তে আরম্ভ কর্লো।

"কিন্তু কি আমি করেছি ?"

"সে কথা তুমিও জানো, আমিও জানি।"

"এটা নিছক গুণ্ডামি।"

"হ্যাঁ। কিন্তু এক মিনিট শেষ হয়েছে। শিগ্গীর এই ভোজালিটা দিয়ে তোমার মমিকে টুক্রো টুক্রো করে কাটো আমার সাম্নে।"

"তুমি পাগল হয়েছো ? আমার নিজের জিনিষকে কেন আমি নষ্ট করবো ? অনেক টাকা দিয়ে কিনেছিলুম।"

"তুমি নিশ্চয়ই ওকে কাট্বে তারপর আমার সামনে এই ঘরে আগুন জ্বেলে পোড়াবে।"

"আমি কিছুই কর্বো না।"

"চার মিনিট শেষ হল।"

চিত্ররথ রিভলভারটা নায়েবের মাথার কাছে তুলে ধর্লো।

এক একটা করে সেকেণ্ড শেষ হতে লাগলো। কাঁপলো তার ডান হাতের আঙুল ট্রিগারের কাছে আর পরমুহূর্তেই নায়েব চীৎকার করে উঠ্‌লো, "নামাও. নামাও তোমার হাত। আমি কাট্‌ছি, এক্ষুনি কাট্‌ছি"

পাগলের মত ক্ষিপ্রতায় ভোজালিটা তুলে নিয়ে নায়েব মমিটাকে মেঝেতে নামালো আর কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তাকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ফেল্‌লো। নানা বিচিত্র শব্দে ঘরটা ভরে গেল যেন, ঘন হল্‌দে রাশি রাশি ধূলো বেরুলো চার হাজার বছরের পুরোনো মমির দেহ থেকে। ওষুধের গন্ধে যেন দম বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু রিভলভার তুলে পাথরের মূর্ত্তির মত চিত্ররথ দাঁড়িয়ে আছে।

কাটা শেষ হলে সে বল্‌লো, "কেরোসিন তেল ঐ ল্যাম্প থেকে ঢালো আর ওই সমস্ত কাগজপত্রও ওর ওপর রেখে দেশ্‌লাই জ্বালাও।"

নায়েব এবার যেন সত্যিই পাগল হয়ে গেল, "না না, কাগজগুলো পুড়িও না। ওগুলো থাক। তুমি জানো না কি অমূল্য সম্পদ্ নষ্ট কর্‌তে যাচ্ছো। তোমাকে এ সব আমি শেখাবো। যা চাও তাই পাবে। অসীম অদ্ভুত ক্ষমতা। দোহাই তোমার ওগুলো থাক্, ওগুলো..."

"Shut up", বজ্রের মত হুঙ্কার দিয়ে উঠলো চিত্ররথ

আর মার খাওয়া জন্তুর মত মাথা নীচু করে নিয়ে সমস্ত কাগজপত্র ও মমির টুকরো জড় করে আগুন ধরালো। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে সব শেষ হল। শুধু ধোঁয়া। চিত্ররথ নামিয়ে নিলো তার রিভল্‌ভার। আর বেরুবার সময় বল্‌লো, "এইবার যদি ইচ্ছে কর যেদিন বল্‌বে যুদ্ধে নাম্‌তে রাজী আছি।—সে যুদ্ধ হবে শুধু মানুষের সঙ্গে মানুষের, মমির সঙ্গে নয়।"

বাইরে সে বেরিয়ে এলো। আকাশে তখনো হেমন্তের কুয়াশায় আর জ্যোৎস্নায় অপরূপ রাত্রি শেষ হয় নি।